রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় রাজার একজন প্রকৃত শিষ্য ও সহচর ছিলেন। তিনি রাজার গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়া পুত্র দেবেন্দ্রনাথকে তাঁহার বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। তাঁহার এই আশা ছিল যে, রাজার মহৎ চরিত্র ও জীবনের সংস্পর্শে আসিলে পুত্রের প্রভূত কল্যাণ হইবে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি পুত্রের কেবল জ্ঞানশিক্ষার জন্য ব্যগ্র ছিলেন না, কিন্তু যাহাতে তাঁহার চরিত্র ও জীবন উন্নতিলাভ করে, তাহার জন্যও যত্নশীল ছিলেন। তাঁহার এই আশা পূর্ণ হইয়াছিল। উক্ত বিদ্যালয়ে পাঠ সমাপ্ত করিয়া দেবেন্দ্রনাথ হিন্দুস্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। তখন সেখানে বিখ্যাত মহাত্মা ডিরোজিও প্রধান শিক্ষক ছিলেন। এই মহাত্মা তৎকালে স্বীয় জ্ঞান, চরিত্র ও জীবনে সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে অনেকে এখনও বঙ্গীয়-সমাজে জ্ঞানী ও চরিত্রবান্ বলিয়া পরিগণিত হইতেছেন।

দেবেন্দ্রনাথের পিতামহী অতি সাধ্বী ও ধার্ম্মিকা রমণী ছিলেন এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান সকল অতিশয় নিষ্ঠা ও ভক্তি সহকারে সম্পন্ন করিতেন। তিনি দেবেন্দ্রনাথকে অতিশয় ভাল বাসিতেন এবং দেবেন্দ্রনাথও অতি শৈশবকাল হইতেই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। সুতরাং পিতামহীর ধর্ম্মনিষ্ঠা ও ভক্তি ধীরে ধীরে দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়ে

সঞ্চারিত হইয়াছিল। বিদ্যালয়ে যাইবার পথে তিনি প্রতিদিন ঠন্‌ঠনিয়ার সিদ্ধেশ্বরীকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিতেন। তিনি বলিতেন, "প্রথম বয়সে উপনয়নের পর যখন গৃহে শালগ্রাম শিলার অর্চ্চনা দেখিতাম, প্রতিদিন যখন বিদ্যালয়ে যাইবার পথে ঠন্‌ঠনিয়ার সিদ্ধেশ্বরীকে প্রণাম করিয়া পাঠের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য বর প্রার্থনা করিতাম, তখন মনের এই বিশ্বাস ছিল যে, ঈশ্বরই শালগ্রাম শিলা, ঈশ্বরই দশভুজা দুর্গা, ঈশ্বরই চতুর্ভুজা সিদ্ধেশ্বরী"।

পিতামহীর দৃষ্টান্ত কি প্রকারে তাঁহার জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিল, এস্থলে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া আবশ্যক। দেবেন্দ্রনাথ বলেন, "ঠাকুরমা প্রতিদিন অতি প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান করিতেন এবং শালগ্রামের জন্য স্বহস্তে পুষ্পমালা গাঁথিয়া দিতেন। কখনো কখনো তিনি সঙ্কল্প করিয়া উদয়াস্ত সাধন করিতেন—সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যের অস্তকাল পর্য্যন্ত সূর্য্যকে অর্ঘ্য দিতেন। আমিও সে সময় ছাতের উপর তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতাম। এবং সূর্য্য-অর্ঘ্যের মন্ত্র শুনিয়া শুনিয়া আমার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল ঃ—

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।

তিনি সকলের আহারান্তে স্বপাকে আহার করিতেন। আমিও তাঁহার হবিষ্যান্নের ভাগী ছিলাম। তাঁহার সেই প্রসাদ আমার যেমন স্বাদু লাগিত, তেমন আপনার খাওয়া ভাল লাগিত না। আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া বাহিরে আসিতে ভালবাসিতাম না।”

বাল্যকালে দেবেন্দ্রনাথ রাজা রামমোহন রায়ের বাটীতে যাতায়াত করিতেন। রাজা তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তাঁহার উদ্যানে অনেক ফলের গাছ ছিল। রাজা দেবেন্দ্রনাথকে স্বহস্তে লিচু প্রভৃতি ফল ভোজন করাইতেন। তাঁহার উদ্যানে একটি দোলনা ছিল। তিনি দেবেন্দ্রনাথকে তাহার উপর বসাইয়া দোলাইতেন এবং শেষে নিজে তাহার উপর বসিয়া বলিতেন, “এবার আমার পালা—আমাকে দোলাও।” এক দিবস দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় পূজার নিমন্ত্রণ করিবার জন্য দেবেন্দ্রনাথকে রাজার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাজা বলিলেন, “আমায় আর পূজার নিমন্ত্রণ কেন, রাধাপ্রসাদের নিকট যাও।” এই কয়টি কথা তিনি এমনভাবে উচ্চারণ করিলেন যে, তাহা বালক দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। রাজা যখন বিলাত গমন করেন, তখন দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার জোড়াসাঁকোর বাটীতে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে দেবেন্দ্রনাথকে ডাকিয়া কিছু বলিয়া বিদায়সূচক করমর্দ্দন করিলেন। সেই স্পর্শ

দেবেন্দ্রনাথের সমস্ত শরীরে এমন এক তড়িৎ-স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল যে, তিনি তাহা কখনও ভুলিতে পারেন নাই।

পঠদ্দশায় তিনি এক দিবস নিশীথকালে একাকী এক উন্মুক্ত স্থানে বসিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ পরে আকাশের দিকে তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হইল। সেই অনন্তপ্রসারিত অগণ্যনক্ষত্রখচিত সুনীল আকাশে তিনি অনন্তের হস্ত দেখিতে পাইলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন, এই যে গম্ভীর অনন্ত আকাশ, এই যে অসংখ্য জীবজন্তু পরিপূর্ণ অসীম ব্রহ্মাণ্ড, এই যে বৃক্ষলতা শোভিত সুশ্যামলা বসুন্ধরা, এ সমস্ত কখনই ক্ষুদ্র, পরিমিত হস্তদ্বারা রচিত হইতে পারে না। ইহা অবশ্য কোন অনন্ত জ্ঞান ও ইচ্ছাসম্পন্ন মহাপুরুষ কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। যে স্বাভাবিক ধর্ম্মপ্রবণতা সাধুশীলা পিতামহীর নিষ্ঠা ও ভক্তির দ্বারা পরিপুষ্ট হইতেছিল তাহা মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের প্রভাবে এবং প্রকৃতি-মাতার সুকোমল স্পর্শে বিকশিত হইয়া ক্রমে অনন্তের প্রতি বিশ্বাসে পরিণত হইল। এই সময় হইতে তাঁহার ক্ষুদ্র দেব-দেবীর উপর বিশ্বাস চলিয়া গিয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যৌবন ও পারিবারিক জীবন।

দেবেন্দ্রনাথ ষোড়শ বৎসরে পদার্পণ করিলে, যশোহরের অন্তর্গত নরেন্দ্রপুর গ্রামের রায়চৌধুরী-পরিবারের শ্রীমতী সারদাদেবীর সহিত তাঁহার পরিণয় হইল। ইহার পর পার্থিব সুখভোগের মধ্যে পড়িয়া তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্মাগ্নি যেন কিছু ম্লান ভাব ধারণ করিল। এই প্রকার শ্রুত হওয়া যায় যে, তাঁহার পিতা তাঁহাকে বিষয়-কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার জন্য নানাপ্রকার সাংসারিক প্রলোভনে ফেলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। যদিও তাঁহার চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে বিফল হইয়াছিল, তথাপি এই সমস্ত প্রলোভন দেবেন্দ্রনাথের কোমল অন্তঃকরণকে যে কিয়ৎ পরিমাণে বিচলিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাঁহার ধর্ম্ম-জীবন-নদী সাগরগামিনী স্রোতস্বতীর ন্যায় যেন ক্ষণ-কালের জন্য সুখাসক্তির শৈলে প্রতিহত হইল। কিন্তু এই অবস্থাতে তাঁহাকে অধিক দিন থাকিতে হয় নাই। বিধাতা যাহার দ্বারা তাঁহার বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সাধন করাইবেন বলিয়া সংকল্প করেন, কাহার সাধ্য তাহাকে সাংসারিক সুখে আবদ্ধ করিয়া রাখে?

দেবেন্দ্রনাথের বয়স এখন আঠার বৎসর। পিতামহীর মৃত্যুকাল উপস্থিত। প্রচলিত প্রথানুসারে তাঁহাকে গঙ্গা-তীরে লইয়া যাওয়া হইল। দেবেন্দ্রনাথও সঙ্গে সঙ্গে গমন করিলেন। পিতামহীর মৃত্যুর পূর্ব্বদিন রাত্রিতে তিনি নিমতলার ঘাটে একখানা চাঁচের উপর বসিয়াছিলেন। আকাশে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইয়াছে। নিকটে শ্মশান। পিতামহীর নিকটে নামসঙ্কীর্ত্তন হইতেছে—"এমন দিন কি হবে, হরিনাম বলিয়া প্রাণ যাবে।" এই সময়ে তাঁহার মনে এক আশ্চর্য্য উদাস ভাব উপস্থিত হইল। ঐশ্বর্য্যের উপর একবারে বিরাগ জন্মিল। মনে অভুতপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হইল।

দেবেন্দ্রনাথের মহত্ত্ব তাঁহার জীবনের এই অধ্যায় হইতে আরম্ভ হইল। যে বয়সে সাধারণ মানুষ সংসারে প্রবেশ করিয়া বিষয়ভোগে নিমগ্ন হয়, যখন ইন্দ্রিয়কুল প্রবল হইয়া মানবকে মোহান্ধ করিয়া রাখে, সেই সময়ে দেবেন্দ্রনাথের মন সংসারাতীত বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইল! পিতামহী "হরিবোল"বলিয়া অঙ্গুলি ঘুরাইতে ঘুরাইতে চলিয়া গেলেন। দেখিয়া দেবেন্দ্রনাথের মনে হইল, তিনি ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহাকে দেখাইয়া গেলেন,—"ঐ ঈশ্বর ও পরকাল!" তিনি পিতামহীর মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া ইহ-জীবনের পরিণাম স্বচক্ষে দর্শন করিলেন। সেই জ্যোৎস্না-বিধৌত নিভৃত নিশীথে পুণ্যসলিলা ভাগীরথীতীরে আপনার

প্রিয়জনের জীবনলীলার পরিণাম দেখিতে দেখিতে, গভীর চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার নিকট সকলই শ্মশানবৎ বোধ হইল; প্রত্যেক বস্তুর উপর তিনি যেন মৃত্যুর ছায়া দেখিতে পাইলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর অতীত নির্ব্বিকার আনন্দময় অনন্তদেবের পবিত্র জ্যোতিঃ তাঁহার চিন্তামগ্ন চিত্তে সমুদ্ভাসিত হইল! বাল্যকালে অসীম আকাশে তিনি যে অনন্তপুরুষের পরিচয় পাইয়াছিলেন, সেই পুরুষই যেন পুনরায় এই সুসময়ে তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া ক্ষণকালের জন্য তাঁহার বিষয়াসক্ত মনকে আপনার দিকে আকর্ষণ করিলেন। তাঁহার অন্তরে বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। সেই সময়ের উদাস ভাবের আনন্দ তাঁহার হৃদয়ে এত প্রবল হইয়া উঠিল যে, সে রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রা হইল না। কিন্তু বিধাতার রাজ্যে সকলই অদ্ভুত ও মানব-বুদ্ধির অগম্য। পিতামহীর মৃত্যুর পরে সেই আনন্দ লাভ করিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ হইল, কিন্তু তাহা তিনি পাইলেন না। তিনি বিষাদে অধীর হইয়া পড়িলেন, পিপাসাতুর পথিকের ন্যায় আকুলহৃদয়ে শান্তিবারি অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, নিম্নলিখিত কয়েক ছত্র সঙ্গীতে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়;—

"হায় কি হবে দিবা আলোকে,
জ্ঞান বিনা সব অন্ধকার।

গত হবে আয়ু, নাহি গেল জানা,
কেমনে তাঁরে পাইব বল না !"

তাঁহার এই সময়কার মানসিক অবস্থা তিনি পুরাণোক্ত নিম্নলিখিত আখ্যায়িকার দ্বারা বিশদ করিয়াছেন :—

নারদ বেদব্যাসের নিকটে আপনার কথা বলিতেছেন— "আমি পূর্ব্বজন্মে কোন এক ঋষির দাসীপুত্র ছিলাম। বর্ষার সময় অনেক সাধু ব্যক্তি ঐ ঋষির আশ্রমে বাস করিতেন। আমি পরম যত্নে তাঁহাদের সেবা করিতাম। ক্রমে ক্রমে আমার মনে জ্ঞানের সঞ্চার হইল ও হরিভক্তির উদয় হইল। ঐ সাধু ব্যক্তিরা যখন আশ্রম হইতে চলিয়া যান, তখন তাঁহারা আমাকে কৃপা করিয়া জ্ঞান উপদেশ প্রদান করেন। জননী ঋষির দাসী, আমি তাঁহার একমাত্র পুত্র। এই জন্যই আমি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারি নাই। একদা নিশাকালে গোদোহন করিবার জন্য জননী বাহিরে গমন করেন। পথিমধ্যে এক কৃষ্ণসর্পের আঘাতে তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। এই ঘটনা আমার অভীষ্ট সিদ্ধির পক্ষে বড় সুবিধাজনক বুঝিয়া সেই আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া এক ভীষণ মহারণ্যে প্রবেশ করিলাম। পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া এক সরোবরে স্নান ও জলপান করিয়া এক অশ্বত্থবৃক্ষতলে উপবেশন করিলাম এবং সাধুগণের প্রদর্শিত উপদেশ অবলম্বন করিয়া আত্মস্থ পরমাত্মাকে চিন্তা করিতে লাগিলাম। সহসা হৃৎপদ্মে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মের সাক্ষাৎলাভ করি-

লাম। সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইল এবং অপার আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইলাম। কিন্তু পরক্ষণে আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। মনে বড় বিষাদ উপস্থিত হইল। পরে আমি আবার ধ্যানস্থ হইয়া তাঁহাকে দেখিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু আর পাইলাম না। তখন বড় ক্লেশ বোধ হইতে লাগিল। ইত্যবসরে এক দৈববাণী হইল—'এ জন্মে তুমি আমাকে আর দেখিতে পাইবে না। যাহারা যোগে অসিদ্ধ, তাহারা আমাকে দেখিতে পায় না। আমি যে একবার দেখা দিলাম ইহা কেবল তোমার অনুরাগ বৃদ্ধির জন্য'।"

পরমাত্মার অভাব বোধ হইতে তাঁহার মনোমধ্যে যুগপৎ দ্বিবিধ ভাবের উদয় হইল। যেখানে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব একত্র সুখোপবিষ্ট হইয়া নৃত্যগীত, হাস্যালাপ এবং ক্রীড়াকৌতুকে নিমগ্ন রহিয়াছে, সেই প্রমোদ-শালার সুখোন্মত্ত ভাব, এক দিকে তাঁহার অন্তঃকরণের গভীর প্রদেশে যাইয়া 'নেতি নেতি' জাগাইয়া তুলিল, অপর দিকে যেখানে ষোড়শোপচারে প্রতিমাপূজার ধূম লাগিয়া গিয়াছে, সেই চণ্ডীমণ্ডপের, মোহান্ধ ভাব তাঁহার মনের গভীর প্রদেশে নেতি নেতি' জাগাইয়া তুলিল।

পিতামহীর মৃত্যুর পর একদিন বৈঠকখানায় বসিয়া তিনি বলিলেন, "আজ আমি কল্পতরু হইলাম। আমার নিকটে আমার দিবার উপযুক্ত যে যাহা চাহিবে, তাহাকে

আমি তাহাই দিব।” এইরূপে বড় বড় আয়না, সুন্দর সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি, জরির পোষাক এবং অন্যান্য বহুমূল্য গৃহসজ্জা সকল দান করিয়া ফেলিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, এই সমস্ত দান করিলে তাঁহার মনে আনন্দের সঞ্চার হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে কিছুই হইল না। অশান্তির অগ্নি মনোমধ্যে পূর্ব্ববৎ জ্বলিতে লাগিল। এক এক দিন তিনি ঈশ্বরের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে এমনি মগ্ন হইতেন যে, কৌচ হইতে উঠিয়া ভোজন করিতে যাইতেন, ফিরিয়া আসিয়া আবার কৌচে পড়িয়া থাকিতেন, অথচ তাঁহার বোধ হইত, যেন তিনি নিরন্তর সেখানেই পড়িয়া আছেন। তখন তিনি দিবসের অধিকাংশ সময় কোম্পানীর বাগানে অতিবাহিত করিতেন। তিনি বলেন, “জীবন নীরস, পৃথিবীর শ্মশানতুল্য। কিছুতেই সুখ নাই, কিছুতেই শান্তি নাই। “দুই প্রহরের সূর্য্যের কিরণরেখা-সকল যেন কৃষ্ণবর্ণ বোধ হইত!”

এই সময়ে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিবার জন্য তাঁহার প্রগাঢ় অভিলাষ জন্মে। বাটীতে কমলাকান্ত চূড়ামণি নামে সভাপণ্ডিত ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার নিকট ‘মুগ্ধবোধ’ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎপরে “মহাভারত” পাঠ করিলেন। তৎকালে তিনি অনেক ইউরোপীয় দর্শনও পাঠ করেন। হিউম, ব্রাউন, ফিক্‌টে, কাণ্ট, কুজিন প্রভৃতি পাঠ করিতেন, কিন্তু ইহাতেও তাঁহার মনের

অশান্তি দূর হইল না। যাঁহারা একবার শিবপুরে কোম্পানীর বাগানে গিয়াছেন, তাঁহারা ইহার সৌন্দর্য কখনও ভুলিতে পারিবেন না। চতুর্দ্দিকে নানাপ্রকার বৃক্ষলতা, ফলপুষ্পে সুসজ্জিত হইয়া, দর্শকের মনে আনন্দের সঞ্চার করিতেছে। বিহঙ্গমগণের সুমধুর কণ্ঠধ্বনিতে সুবিস্তীর্ণ উদ্যান সর্ব্বদা মুখরিত হইতেছে। এই নির্জ্জন প্রদেশে যুবক দেবেন্দ্রনাথ যৌবনকালের সুখাসক্তির প্রবল স্পৃহাকে বৈরাগ্যের অনলে ভস্মীভূত করিয়া, অতুল ঐশ্বর্য্য ও সম্পত্তির দুর্গন্ধময় শবের উপর সাধনের আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া, অনন্ত সৌন্দর্য্যের প্রস্রবণকে অনুসন্ধান করিবার জন্য দিবসের পর দিবস অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এক দিকে সংস্কৃত ও ইংরাজী দর্শন সমূহ অধ্যয়ন, অন্য দিকে নির্জ্জন স্থানে বাস করিয়া গভীর চিন্তা—এই উভয়ের মিলনে তিনি প্রতিদিন নব নব সত্য লাভ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার বিষাদমেঘ অনেক পরিমাণে কাটিয়া গেল এবং তিনি কিছু শান্তি লাভ করিলেন। তিনি বুঝিলেন যে, এই অসীম ব্রহ্মাণ্ড অনন্তের দ্বারা সৃষ্ট হইয়া অনন্তের দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছে। সেই অনন্তদেব কালীঘাটের কালীও নহেন, আর তাঁহাদের বাড়ীর শালগ্রামও নহেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, এখন হইতে কোন প্রকার প্রতিমাপূজায় ও পৌত্তলিকতায় যোগদান করিবেন না। যুবক দেবেন্দ্রনাথ

তখন বুঝিতে পারিলেন না যে, তিনি কি অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

তিনি ভ্রাতাদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, পূজার সময়ে পূজার দালানে প্রবেশ করিবেন না, এবং যদি কেহ যান, তাহা হইলে প্রতিমাকে প্রণাম করিবেন না। তখন সন্ধ্যাকালে আরতির সময় তাঁহার পিতা দালানে যাইতেন, সুতরাং ভয়ে ভয়ে তাঁহারাও যাইতেন। কিন্তু প্রণামের সময় যখন সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেন, তাঁহারা দাঁড়াইয়া থাকিতেন, প্রণাম করিলেন কি না, কেহ দেখিতে পাইত না।

দেবেন্দ্রনাথের মনে একটা ভ্রম ছিল যে, সমুদায় হিন্দুশাস্ত্র পৌত্তলিকতার শাস্ত্র। যখন তাঁহার মনের এই ভাব তখন হঠাৎ একদিন একখানা সংস্কৃত পুস্তকের ছিন্ন পত্র তাঁহার সম্মুখ দিয়া উড়িয়া যাইতে দেখিলেন। তিনি তাহা ধরিলেন, এবং শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্যকে তাহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্যামাচরণ বলিলেন, সেই পত্রে লিখিত শ্লোকের অর্থ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বলিতে পারেন। বিদ্যাবাগীশকে ডাকিয়া পাঠান হইল। তিনি ইহা পড়িলেন। ইহাতে লেখা ছিল ;—

"ঈশাবাশ্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাঞ্জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মাগৃধঃ কস্যচিদ্ধনম্।"

বিদ্যাবাগীশ ইহার অর্থ বুঝাইয়া দিলেন ;—"এই

ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত যে কিছু পদার্থ সমুদায়ই পরমেশ্বরের দ্বারা ব্যাপ্য রহিয়াছে। পাপচিন্তা ও বিষয়লালসা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ কর; কাহারও ধনে লোভ করিও না।”

দেবেন্দ্রনাথ শ্রবণ করিয়া আনন্দে অধীর হইয়া পড়িলেন, এবং ভাবিলেন, তিনি এতদিন যাহার অনুসন্ধান করিতেছেন, তাহা পাইলেন। এই ছিন্ন পত্র স্বয়ং ঈশ্বরের সাক্ষাৎ দান।

এখন হইতে উপনিষদের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিল। তিনি বুঝিলেন যে, সমস্ত হিন্দুশাস্ত্র পৌত্তলিকতার উপদেশ দেয় না। এমন সমস্ত গ্রন্থ আছে, যাহাতে সেই একমেবাদ্বিতীয়ং অনন্তদেবের অনেক পরিচয় আছে। অতঃপর তিনি বিদ্যাবাগীশের নিকট ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য উপনিষদ্ পাঠ করেন, এবং অন্যান্য পণ্ডিতগণের সাহায্যে অবশিষ্ট প্রধান ছয় খানি উপনিষদ্ পাঠ করেন। উপনিষদে তাঁহার এমন অনুরাগ জন্মিয়াছিল যে, তিনি এক জন দ্রাবিড়ী পণ্ডিত রাখিয়া উপনিষদ্ শুদ্ধরূপে উচ্চারণ করিতে শিখিয়াছিলেন।

তাঁহার ৫টি কন্যা ও ৭টি পুত্রসন্তান হইয়াছিল। প্রথমা কন্যা অল্প বয়সে ইহসংসার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। অবশিষ্ট পুত্রকন্যাদিগকে তিনি অত্যন্ত যত্নের সহিত শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার এক কন্যা

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী। ইঁহার শিক্ষা ও জ্ঞান ইঁহাকে ভারতের বিদুষী রমণীদিগের মধ্যে উচ্চস্থান প্রদান করিয়াছে। কেবল ভারতে নয়, ইনি সুসভ্য ইউরোপ ও আমেরিকাতেও অনেকের নিকট পরিচিতা। দেবেন্দ্রনাথের পুত্রদিগের মধ্যে দার্শনিক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বঙ্গীয় বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর মধ্যে উচ্চস্থান গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় জজ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ আপনার বিনয়, চরিত্র ও গম্ভীরভাবপূর্ণ উচ্চ ঈশ্বরবিষয়ক সঙ্গীত-রচনা দ্বারা সকলকে মুগ্ধ করিয়াছেন। সংস্কৃত কাব্য ও নাটকাদির অনুবাদক এবং সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নানাপ্রকারে আপনার শক্তির পরিচয় দিতেছেন। সর্ব্বশেষে কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের পরিচয় আর কি দিব? যিনি বঙ্গীয় কাব্যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন, যাঁহার গদ্য ও পদ্য রচনা পাঠ করিতে করিতে পাঠকেরা আত্মহারা হইয়া যান, যাঁহার সুমধুর কণ্ঠনিসৃত স্বরচিত সঙ্গীতাবলী শ্রোতৃমণ্ডলীকে চিরকাল বিমুগ্ধ করিয়াছে, যিনি নানাপ্রকারে স্বদেশের সেবার জন্য সর্ব্বদাই সকল প্রকার স্বার্থসুখ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত, সেই প্রতিভাশালী রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেক বঙ্গীয় পাঠক ও পাঠিকার হৃদয়ের পূজা গ্রহণ করিতেছেন। দেবেন্দ্রনাথের পরিবার যেন লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মিলনের ভূমি, এই প্রকার পরিবার ভারতের আর কোথাও আছে বলিয়া মনে হয় না।

ধর্ম্ম স্বয়ং যে বৃক্ষের মূলরূপে বর্ত্তমান, সেই বৃক্ষের শাখা প্রশাখা সকল যে জ্ঞান, ভক্তি ও সাধুতারূপ সুরসাল ফল প্রসব করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি!

সন্তানদিগের শিক্ষার জন্য দেবেন্দ্রনাথ অন্যের উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন না, স্বয়ং তাহার তত্ত্বাবধান করিতেন। এইরূপ শ্রুত হওয়া যায়, তিনি পুত্রদিগের মধ্যে কাহারও উপর সঙ্গীত রচনার ভার এবং কাহারও উপর প্রবন্ধাদি লিখিবার ভার দিয়া স্বয়ং সে সমস্ত পরীক্ষা করিতেন। তিনি প্রতিদিন সন্তানদিগকে লইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিতেন এবং সামাজিক ব্রহ্মোপাসনার দিনে তাঁহাদিগকে উপাসনামন্দিরে লইয়া যাইতেন। পুত্রেরা কখন কি করিতে ছেন, তাহার সংবাদ লইতেও তিনি বিরত ছিলেন না।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার সন্তানদিগের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ। তাঁহার বয়স যখন ১০ কিম্বা ১১ বৎসর তখন তিনি একবার তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া পাহাড়ে গিয়াছিলেন। সেখানে অতি প্রত্যূষে তাঁহাকে জাগাইয়া দিতেন এবং উপক্রমণিকার সন্ধি ও শব্দরূপাদি অভ্যাস করিতে বলিতেন। নিজে যখন শীতল জলে স্নান করিতেন, তখন পুত্রকেও শীতল জলে স্নান করিতে আদেশ দিতেন। রবীন্দ্র বাবু বলেন যে, তাহাতে তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট হইত, কিন্তু পিতার আদেশ প্রতিপালন করিতেই হইত। অনেক সময়ে তাঁহাকে জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে নিজে শিক্ষা দিতেন।

জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা করিতে তিনি নিজে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, সুতরাং সন্তানকেও সেই শিক্ষা দিয়াছিলেন। রবীন্দ্র বাবু ১০।১১ বৎসর বয়সের সময় বাঙ্গলাতে গদ্য ও পদ্য লিখিতেন। সে সমস্ত পাঠ করিয়া তাঁহার ভাল লাগিত এবং আরও লিখিবার জন্য তিনি উৎসাহ প্রদান করিতেন।

দেবেন্দ্রনাথ বৎসরের অধিকাংশ সময়ই বাহিরে থাকিতেন। পর্ব্বত, অরণ্য, নদীবক্ষ, নির্জ্জন প্রান্তরই তাঁহার প্রকৃত বাসস্থান ছিল. কলিকাতাতে তিনি অল্পসময়ই অতিবাহিত করিতেন। কিন্তু এইরূপ বাহিরে বাহিরে ভ্রমণ করিয়াও বিষয়কর্ম্মের সমস্ত সংবাদ রাখিতেন এবং কর্ম্মচারীদিগকে যথাসময়ে উপযুক্ত পরামর্শ দিয়া বিষয়সম্পত্তি রক্ষা করিতেন। যদিও তিনি সাক্ষাৎভাবে বিষয়কর্ম্মে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না, কিন্তু কি পরিবারে, কি তাঁহার প্রকাণ্ড জমিদারীর মধ্যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই তাঁহার একটা প্রভাব ও শাসন সর্ব্বদা অনুভব করিতেন। ফলতঃ তিনি ধর্ম্ম ও ন্যায়ের পথে থাকিয়া যেরূপে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন ও বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা করিতেন, তাহা চিন্তা করিলে তদ্রূপ পরিশ্রম,অধ্যবসায়,চিন্তাশীলতা ও ধর্ম্মজ্ঞান এ জগতে দুর্লভ বলিয়া মনে হয়। তাঁহাতে আমরা সংসারী ও যোগীর সমাবেশ দেখিতে পাই। সংসারে থাকিয়া যে ধর্ম্মসাধন করা যায়, তাহার দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান যুগে দেবেন্দ্রনাথের জীবনে অতি উজ্জ্বলরূপে দেখিতে পাওয়া যায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

তাঁহার মহত্ত্বপরিচায়ক বিশেষ বিশেষ কার্য্য।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, দেবেন্দ্রনাথের হৃদয় নিরন্তর অনন্তের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার দিকে ধাবিত হইতেছিল। সেই অনন্তের তত্ত্ব আলোচনা করিয়া জীবনে পরিস্ফুট করিবার জন্য তিনি ১৭৬১ শকের ২১ আশ্বিনে "তত্ত্ববোধিনী সভা" স্থাপন করেন। এই সময়ে বঙ্গীয় সাহিত্যের অন্যতম উজ্জ্বলরত্ন শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। সভার অন্যান্য সভ্যগণের মধ্যে প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়, অক্ষয়কুমার দত্ত ও কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদিগের সাহায্যে "তত্ত্ব-বোধিনী সভা"র কার্য্য অতিশয় উৎসাহ ও দক্ষতার সহিত সম্পন্ন হইতে লাগিল। অতঃপর এই সভার কার্য্য ও ব্রহ্মবিদ্যা প্রচারের সংকল্প তাঁহার মনে উদিত হয়, এবং সেই উদ্দেশ্যে ১৭৬৫ শকে "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" প্রকাশ করেন। তিনি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তকে এই পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত করিয়া মহা উৎসাহ ও যত্নের সহিত ইহার পরিচালনা করিতে লাগিলেন। সেই সময় দুই একখানা অতি সামান্য

সংবাদ-পত্র এদেশে প্রচলিত ছিল। তাহাতে লোকহিতকর জ্ঞানগর্ভ কোন প্রবন্ধই প্রকাশিত হইত না। "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" সেই অভাব প্রথম পূরণ করে। ইহাতে দ্বৈত ও অদ্বৈত মতের বিচার, বেদ-বেদান্তের সত্যসমূহ ও পরব্রহ্মের উপাসনার প্রচার হইতে লাগিল।

দেবেন্দ্রনাথ এইরূপে ব্রহ্মসাধন ব্রহ্মজ্ঞানলাভ, ও ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারে যৌবনকাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার পিতা বিরক্ত হইলেন। একদিন তিনি বলিলেন, "রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকে ভাল লোক বলিয়া জানিতাম। এখন দেখি যে, তিনি দেবেন্দ্রের কাণে ব্রহ্মমন্ত্র দিয়া তাহাকে খারাপ করিতেছেন। একে তার বিষয়বুদ্ধি অল্প, তাহাতে আবার সে 'ব্রহ্ম' 'ব্রহ্ম' করিয়া আর কিছুতেই মন দেয় না।" দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় বড় বড় সাহেবদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া বেলগাছিয়ার বাগানে মধ্যে মধ্যে ভোজ দিতেন। একবার লর্ড অকল্যাণ্ড, তাঁহার ভগিনী ও অন্যান্য বড় বড় সাহেব মেমদিগকে মহাভোজ দেওয়া হয়। "রূপে, গুণে, সৌন্দর্য্যে, নৃত্যে, আলোকে বাগান একেবারে ইন্দ্রপুরী হইয়া গিয়াছিল।" এই ভোজ দেখিয়া কোন কোন বাঙ্গালী বলিয়াছিলেন, "ইনি কেবল সাহেবদের ভোজ দেন, বাঙ্গালীদিগকে ডাকেন না।" এই কথা শুনিয়া দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় একদিন প্রধান প্রধান বাঙ্গালীদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সেদিন তাঁহাদিগকে

অভ্যর্থনা করিবার ভার দেবেন্দ্রনাথের উপর অর্পিত হইয়াছিল। কিন্তু ঘটনাক্রমে সেই দিন "তত্ত্ববোধিনী সভা"র অধিবেশনের দিন পড়াতে তিনি সেখানে যাইতে পারেন নাই। ইহাতে তাঁহার পিতা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ বলেন, "তাঁহার মনের নিতান্ত অভিলাষ যে, আমি তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিয়া পদ ও মান-মর্য্যাদাতে সকলের শ্রেষ্ঠ ও যশস্বী হই। কিন্তু তিনি আমার মনে তাহার বিপরীত ভাব দেখিতে পাইয়া নিতান্ত দুঃখিত ও বিষণ্ণ হইয়াছিলেন। তখন যে আমি উপনিষদে পড়িয়াছি, 'ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ'। মনুষ্য কখনও বিত্ত দ্বারা তৃপ্ত হয় না।' আর কি কেহ আমাকে বিষয়েতে ডুবাইতে পারে? আর কি কেহ আমাকে ঈশ্বরের নিকট হইতে দূরে লইয়া যাইতে পারে?"

১৭৬৫ শকের ৭ই পৌষ দেবেন্দ্রনাথপ্রমুখ ২১ জন যুবক প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্মব্রত গ্রহণ করেন। ইহাতে এমন একটা সুবাতাস দেশের মধ্যে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল যে,১৭৬৭ শকের পৌষ মাসের মধ্যে ৫০০জন যুবক প্রতিজ্ঞা-পূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে তিনি কি প্রকার দৃঢ়তার সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন করিয়াছিলেন, তাঁহার লিখিত দুই ছত্রের দ্বারা তাহা বুঝিতে পারা যায়। তিনি বলিতেছেন, "আমি সম্যক্‌রূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপালনের জন্য প্রতিদিনই অভুক্ত অবস্থায় অতন্দ্রিত ও সংযত হইয়া গায়ত্রীর

দ্বারা তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিলাম।" তখন তাঁহার বয়স ২৮ বৎসর মাত্র। এই সময়ে তিনি যে সমস্ত সত্য ও জ্ঞান, আপনার কঠোর তপস্যা ও সাধনার দ্বারা হৃদয়ে লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা সাধকদিগের পক্ষে অতি মূল্যবান্।

খৃষ্টিয়ান্ পাদরীরা অত্যন্ত যত্ন ও উৎসাহের সহিত তাঁহাদিগের ধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের "হাউসের" একজন কর্ম্মচারী রাজেন্দ্রনাথ সরকার একদিন দেবেন্দ্রনাথের নিকট আসিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, "গত রবিবারে আমার স্ত্রী ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা উমেশ-চন্দ্রের স্ত্রী, দুইজনে একখানা গাড়ীতে চড়িয়া নিমন্ত্রণে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে, উমেশ আসিয়া তাহার স্ত্রীকে গাড়ী হইতে জোর করিয়া নামাইয়া লয়, এবং উভয়ে খৃষ্টান হইবার জন্য ডফ সাহেবের বাড়ীতে চলিয়া যায়। আমার পিতা অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহা-দিগকে সেখান হইতে ফিরাইয়া আনিতে না পারিয়া অবশেষে সুপ্রীম-কোর্টে নালিশ করেন। নালিশে আমাদের হার হয়। কিন্তু আমি ডফ্ সাহেবের নিকট গিয়া অনুনয় বিনয় করিয়া বলিলাম যে, 'আবার আমরা কোর্টে নালিশ করিব। দ্বিতীয়বার বিচারের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত আমার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূকে খৃষ্টান করিবেন না।' কিন্তু তিনি তাহা না শুনিয়া গতকল্যই সন্ধ্যার সময় তাহাদিগকে

খৃষ্টান করিয়া ফেলিয়াছেন।” এই কথা শুনিয়া দেবেন্দ্র-নাথের কোমল হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি ভাবিলেন যে, “পাদ্রীরা অন্তঃপুরের স্ত্রীলোকদিগকে পর্য্যন্ত খৃষ্টান করিয়া গৃহে গৃহে অশান্তির আগুন জ্বালিতেছেন। ইহার প্রতিবিধান করা উচিত।” এই ভাবিয়া তিনি অক্ষয়-কুমার দত্তকে “তত্ত্ববোধিনী” পত্রিকাতে একটি প্রবন্ধ বাহির করিতে বলিলেন। অক্ষয় বাবুর চিন্তাশীল প্রবন্ধ উক্ত পত্রিকাতে প্রকাশিত হইলে, পাঠ করিয়া কলিকাতার শিক্ষিত হিন্দুরা উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। এদিকে দেবেন্দ্র-নাথও গাড়ি করিয়া প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের নিকট যাইয়া অনুরোধ করিতে লাগিলেন যে, তাঁহারা সন্তানদিগকে আর যেন পাদ্রীদিগের বিদ্যালয়ে প্রেরণ না করেন এবং নিজেরা একটি বিদ্যালয় খুলিবার বন্দোবস্ত করেন। রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতিকে উৎ-সাহিত করিলেন। ইহাতে “ধর্ম্মসভা” ও “ব্রহ্মসভার” মধ্যে যে অসদ্ভাব ছিল, তাহা বিদূরিত হইল। ১৭৬৭ শকে ১৩ই জ্যৈষ্ঠ এক মহাসভা হইল। তাহাতে প্রায় এক সহস্র ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। স্থির হইল যে, পাদ্রীদের বিদ্যালয়ে বালকেরা যেমন বিনা বেতনে পড়িতে পায়, তাঁহাদের বিদ্যালয়েও তেমনি তাহারা বিনা বেতনে পড়িতে পারিবে। সেই এক রাত্রিতে ৪০ হাজার টাকা স্বাক্ষর হইয়া গেল।

এই সভা কর্ত্তৃক "হিন্দু-হিতার্থী" নামে এক বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইল এবং তাহার কর্ম্ম সম্পাদনের জন্য রাজা রাধাকান্ত দেব সভাপতি, দেবেন্দ্রনাথ ও হরিমোহন সেন সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই অবৈতনিক বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন।

"তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকাতে প্রকাশিত প্রবন্ধ এবং ব্রাহ্ম-সমাজের সাপ্তাহিক উপদেশ দ্বারা যখন ব্রাহ্মধর্ম্মের বিমল জ্যোতিঃ দেশ বিদেশে বিকীর্ণ হইতে লাগিল, যখন দেশের গণ্য, মান্য ও শিক্ষিত সম্প্রদায় ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্যসমূহ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলেন, তখন খৃষ্টিয়ানেরা বিষম প্রমাদ গণিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, যাঁহাদিগকে তাঁহারা অকর্ম্মণ্য ভাবিয়াছিলেন, যাঁহাদিগের সন্তানগণের শিক্ষার ভার তাঁহারা নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই আবার এক নূতন বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া উৎসাহ ও যত্ন সহকারে উহার কার্য্য সুসম্পন্ন করিতেছেন। তাঁহারা আশা করিতেছিলেন যে, এক সময়ে সমস্ত ভারতকে খৃষ্ট-ধর্ম্মের আশ্রিত দেখিতে পাইবেন। কিন্তু হঠাৎ এই নব ধর্ম্মের অভ্যুত্থান ও তাহার প্রচারের জন্য প্রাণগত চেষ্টা, যত্ন ও উৎসাহ দর্শনে তাঁহারা অধিকতর বিষণ্ণ হইলেন। "তত্ত্ববোধিনীতে" যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত, তাঁহারা তাহার সমালোচনা করিতে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের ঐকান্তিক সাধন ও অক্ষয়কুমারের গভীর

চিন্তাশীলতাপ্রসূত যুক্তিসমূহের নিকট সে সমস্ত সমালোচনা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত। পাদ্রীরা যখন দেখিলেন যে, তাঁহাদিগকে যুক্তিতে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, তখন তাঁহারা অন্য পথ অবলম্বন করিলেন। তাঁহারা অন্যায়রূপে ব্রাহ্মদিগের চরিত্র আক্রমণ করিতে লাগিলেন। ডাক্তার ডফপ্রমুখ পাদ্রীগণ পুস্তিকা প্রকাশ ও বক্তৃতা দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে অনেক অযথা কথা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। এইরূপে দুই পক্ষে মহা সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ইহার ফল কি হইয়াছে, তাহা সাধারণ পাঠকেরা পর্য্যন্ত অবগত আছেন। প্রথমে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, পরে তাঁহার পথানুবর্ত্তী দেবেন্দ্রনাথ এবং তৎপরে সমস্ত ব্রাহ্মসমাজ যদি এইরূপ ভাবে দেশীয় শিক্ষিত যুবকদিগের অন্তঃকরণে বিশুদ্ধ জ্ঞান ও সত্যের আলোক প্রদর্শন না করিতেন, তাহা হইলে এতদিনে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই যে হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতেন, ইহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

নৈতিক সাহস।

দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম্মব্রত গ্রহণ করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, আর কখনও কোন পৌত্তলিক অনুষ্ঠানে যোগদান করিবেন না। কিন্তু ইহা তখন তাঁহার পক্ষে যে কি প্রকার কঠিন ব্যাপার ছিল, তাহা আমরা

বুঝিতে পারি না। তাঁহার পিতা তখন ধনে, ঐশ্বর্য্যে, সম্পদে, মানে বঙ্গদেশে অদ্বিতীয় ছিলেন। তখন হুগলী, পাবনা, রাজসাহী, কটক, মেদিনীপুর, রঙ্গপুর, ত্রিপুরা, প্রভৃতি জেলার বৃহৎ বৃহৎ জমিদারী এবং নীলের কুঠি, সোরা, চিনি, চা প্রভৃতির বিস্তৃত ব্যবসায় তাঁহার হাতে ছিল। ইহার সঙ্গে আবার রাণীগঞ্জের কয়লার খনির কাজ চলিতেছে। তখন তাঁহাদের সম্পদের মধ্যাহ্ন সময়। ইউ-রোপেও তাঁহার কি প্রকার প্রতিপত্তি ছিল, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। একবার তিনি প্যারিস নগরে এক ভোজ দিয়াছিলেন। তাহাতে বহু সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও রমণী উপস্থিত ছিলেন। ষোড়শোপচারে তাঁহাদিগের আহার সমাপ্ত হইলে, তিনি প্রত্যেক মহিলাকে এক খানি করিয়া বহুমূল্য ভারতীয় শাল উপহার প্রদান করেন। ইহাতে তাঁহারা অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হয়েন। একবার ইটালী-দেশীয় এক জন প্রসিদ্ধ চিত্রকর তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিল, "মহাশয়, আপনার নাম শুনিয়া আসিয়াছি। আপনার একখানি চিত্র অঙ্কন করিব।" তৎক্ষণাৎ তিনি চিত্র অঙ্কন করিতে অনুমতি দিলেন এবং তাহা শেষ হইলে পর চিত্রকরকে ৪৫০০০৲ হাজার টাকা পুরস্কার দিলেন। এইরূপ নানাপ্রকার দান ও পুরস্কার প্রদান দ্বারা তিনি ইউরোপে অনেক খ্যাতি অর্জ্জন করেন। এই জন্য তাঁহাকে প্রিন্স উপাধি প্রদান করা হয়। যখন তাঁহাদের এইরূপ সম্পদের

অবস্থা, তখন তাঁহাদের বাটীতে যে কি ভাবে শারদীয় পূজা সম্পন্ন হইত, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। দেবেন্দ্রনাথ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, কোন পৌত্তলিক অনুষ্ঠানে যোগ দিবেন না। যখন তাঁহাদের বাটীতে দুর্গোৎসব হইত, তখন তিনি কেবল আহার ও নিদ্রার জন্য বাটীতে যাইতেন মাত্র, বাকী সময় পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র আপনার বিশ্বাসবিরোধী কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতেছে বলিয়া তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না এবং দরিদ্রের ন্যায় পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। এ প্রকার বিশ্বাসানুযায়ী কার্য্য করিবার সাহস জগতে বড়ই বিরল।

তাঁহার নৈতিক সাহসের আর একটী দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল। ১৭৭৮ শকের শ্রাবণ মাসে লণ্ডন নগরে দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের মৃত্যু হয়। তখন তাঁহার বয়স ৫১ বৎসর। ভাদ্র মাসে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি যথারীতি অশৌচ ধারণ পূর্ব্বক হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। পিতৃবিয়োগে পুত্রের যেরূপ কঠোর তপশ্চর্য্যা করিতে হয়, তাহা তিনি সমস্তই করিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যুসংবাদ অচিরে কলিকাতায় সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। তাঁহার অর্থসামর্থ্য ও প্রতিপত্তির উপযুক্ত শ্রাদ্ধ করিবার জন্য আত্মীয় স্বজনেরা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

যাহাতে এই ক্রিয়া তাঁহার নামের উপযুক্ত হয়, তদ্বিষয়ে সকলে যত্নবান্ হইলেন। দেবেন্দ্রনাথের খুল্লতাত রমানাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিলেন যে, "দেখো, ব্রহ্ম ব্রহ্ম করে এ সময় কোন গোলমাল তুলিও না। দাদার বড় নাম।" দেবেন্দ্রনাথ এই সময় একদিন রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। দেব বাহাদুর তাঁহাকে কাছে বসাইয়া বলিলেন, "শাস্ত্রে যেমন বিধান আছে, সই অনুসারে শ্রাদ্ধটি বিশুদ্ধ ভাবে সম্পন্ন করিও।" কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ বহু পূর্ব্ব হইতে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে,সমস্ত অনুষ্ঠান তাঁহার বিশ্বাস অনুসারে করিবেন। সুতরাং তিনি সবিনয়ে উত্তর করিলেন, তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার বিরুদ্ধে কোন কাজ করিতে পারিবেন না। তাহা করিলে ধর্ম্মে পতিত হইতে হইবে। রাধাকান্ত দেব আবার বলিলেন, "সে হবে না, সে হবে না। আমি যাহা বলিতেছি শুন।" এইবার তাঁহার জীবনে কঠোর পরীক্ষা আরম্ভ হইল। একদিকে রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন, অন্য দিকে তিনি একাকী। তাঁহারা সকলে ক্রমাগত শাস্ত্রানুযায়ী অনুষ্ঠান করিতে তাঁহাকে পরামর্শ দিতে লাগিলেন। এই সঙ্কটের সময় তিনি আর কাহারও উৎসাহ পাইলেন না। কেবল এক ব্যক্তি তাঁহাকে সাহস দিয়াছিলেন। তিনি একজন ধর্ম্মনিষ্ঠ

পশ্চিমদেশীয় হিন্দুস্থানী যুবক। তাঁহার নাম হাজারীলাল। তাঁহার এই সময়কার মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে মহর্ষি বলেন, "এই আলোচনা ও শোচনাতে রাত্রিতে আমার ভাল নিদ্রা হয় না। একে পিতৃবিয়োগ, তাহাতে এই লৌকিকতাতে সারাদিন পরিশ্রম ও কষ্ট, তাহার উপর আমার এই আন্তরিক ধর্ম্মযুদ্ধ। ধর্ম্মের জয়, কি সংসারের জয়, কি হয় বলা যায় না, এই ভাবনা। এই সকল চিন্তাতে ও শোচনাতে রাত্রিতে নিদ্রা হয় না। বালিসের উপর মাথা ঘুরিতে থাকে। রাত্রিতে একবার তন্দ্রা আসিতেছে, আবার জাগিয়া উঠিতেছি। নিদ্রা জাগরণের যেন সন্ধিস্থলে রহিয়াছি। এই সময়ে সেই অন্ধকারে একজন আসিয়া বলিল— 'উঠ।' আমি অমনি উঠিয়া বসিলাম। সে বলিল, 'বিছানা হইতে নাম।' আমি বিছানা হইতে নামিলাম। সে বলিল, 'আমার পশ্চাতে পশ্চাতে এসো।' আমি তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলাম। বাড়ীর ভিতর যে সিঁড়ি তাহা দিয়া সে নামিল, আমিও সেই পথে নামিলাম নামিয়া তাহার সঙ্গে উঠানে আসিলাম। সদর দেউড়ীর দরজায় দাঁড়াইলাম। দরওয়ানেরা নিদ্রিত। সে সেই দরজা ছুঁইল, অমনি তাহার দুই কপাট খুলিয়া গেল। আমি তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া বাড়ীর সম্মুখের রাস্তায় আসিলাম। ছায়াপুরুষের ন্যায় তাহাকে বোধ হইল। আমি তাহাকে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি না, কিন্তু সে আমাকে যাহা বলিতেছে, তৎ-

ক্ষণাৎ আমাকে তাহা বাধ্য হইয়া করিতে হইতেছে। এখান হইতে সে ঊর্দ্ধে আকাশে উঠিল, আমিও তাহার পশ্চাতে আকাশে উঠিলাম। পুঞ্জ পুঞ্জ গ্রহনক্ষত্র, তারকা সকল দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে, সমুজ্জ্বল হইয়া আলোক দিতেছে, আমি তাহার মধ্য দিয়া চলিয়া যাইতেছি। যাইতে যাইতে একটা বাষ্প-সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। সেখানে আর তারা, নক্ষত্র কিছুই দেখিতে পাই না। বাষ্পের মধ্যে খানিক দূর যাইয়া দেখি যে, সেই বাষ্প-সমুদ্রের উপদ্বীপের ন্যায় একটি পূর্ণচন্দ্র স্থির হইয়া রহিয়াছে। তাহার যত নিকটে যাইতে লাগিলাম, সেই চন্দ্র ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আর তাহাকে গোলাকার বলিয়া বোধ হইল না। দেখিলাম,তাহা আমাদের পৃথিবীর ন্যায় চেটাল। সেই ছায়াপুরুষ গিয়া সেই পৃথিবীতে দাঁড়াইল, আমিও সেই পৃথিবীতে দাঁড়াইলাম। সে সমুদায় ভূমি শ্বেত-প্রস্তরের। একটি তৃণ নাই। না ফুল আছে, না ফল আছে। কেবল শ্বেত মাঠ ধূ ধূ করিতেছে। তাহার যে জ্যোৎস্না তাহাও সে সূর্য্য হইতে পায় না। সে আপনার জ্যোতিতে আপনি আলোকিত। তাহার চারিদিকে যে বাষ্প তাহা ভেদ করিয়া সূর্য্যরশ্মি আসিতে পারে না। তাহার নিজের যে রশ্মি, তাহা অতি স্নিগ্ধ। এখানকার দিনের ছায়ার ন্যায় সেখানকার সে আলোক। সেখানকার বায়ু সুখস্পর্শ। মাঠ দিয়া যাইতে যাইতে সেখানকার একটা নগরের মধ্যে প্রবেশ

করিলাম। সকল বাড়ী, সকল পথ শ্বেত প্রস্তরের। স্বচ্ছ ও পরিষ্কার রাস্তায় একটি লোকও দেখিলাম না, কোন কোলাহল নাই, সকলই প্রশান্ত। রাস্তার পার্শ্বে একটা বাড়ীতে আমার নেতা প্রবেশ করিয়া দোতলায় উঠিল, আমিও তাহার সঙ্গে উঠিলাম। দেখি যে, একটা প্রশস্ত ঘর। ঘর শ্বেত পাথরের, টেবিলও শ্বেত পাথরের, কতকগুলি চৌকিও রহিয়াছে। সে আমাকে বলিল, 'বসো'। আমি একটা চৌকিতে বসিলাম। সে ছায়া বিলীন হইয়া গেল। আর সেখানে কেহই নাই। আমি সেই নিস্তব্ধ গৃহে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছি, খানিক পরে দেখি যে, সেই ঘরের সম্মুখের একটা দরজার পর্দা খুলিয়া উপস্থিত হইলেন—আমার মা! মৃত্যুর দিবসে তাঁহার যেমন চুল এলানো দেখিয়াছিলাম, সেইরূপ তাঁহার চুল এলানোই রহিয়াছে। আমি ত তাঁহার মৃত্যুর সময় মনে করিতে পারি নাই যে, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর যখন শ্মশান হইতে ফিরিয়া আসিলাম, তখনও মনে করিতে পারি নাই যে, তিনি মরিয়াছেন। আমার নিশ্চয় যে, তিনি বাঁচিয়াই আছেন। এখন দেখিলাম, আমার সেই জীবন্ত মা আমার সম্মুখে! তিনি বলিলেন—'তোকে দেখ্‌বার ইচ্ছা হইয়াছিল, তাই ডাকিয়া পাঠাইয়াছি। তুই না কি ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াছিস্? কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা!' তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার এই মিষ্ট কথা শুনিয়া, আনন্দ-

প্রবাহে আমার তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। দেখি যে, আমি সেই বিছানাতেই ছট্‌ফট্‌ করিতেছি।”

উক্ত ঘটনাটি অনেকে অনেক ভাবে গ্রহণ করিবেন; কিন্তু ইহা দ্বারা দেবেন্দ্রনাথের যে প্রভূত উপকার হইয়াছিল, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। কারণ, ইহার পর তিনি হৃদয়ে এমন এক শক্তিলাভ করিলেন যে আর তাঁহাকে কেহ বিচলিত করিতে পারিল না। তিনি প্রতিজ্ঞাতে অটল রহিলেন এবং আপনার বিশ্বাসমত কার্য্য করিবার জন্য এক শ্লোক নির্ব্বাচন করিয়া, শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্যকে বলিয়া রাখিলেন যে, দানোৎসর্গের সময় তিনি তাঁহাকে এই মন্ত্র পড়াইবেন। ক্রমে শ্রাদ্ধের দিন উপস্থিত হইল। বাড়ীর সম্মুখে একটী বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে এক প্রশস্ত চালা প্রস্তুত হইল এবং সোণা রূপার যোড়শে ও অন্যান্য দানসামগ্রীতে সেই চালা সজ্জিত হইল। ক্রমে ক্রমে জ্ঞাতি ও বন্ধুবান্ধবেরা আসিতে আরম্ভ করিলেন। প্রাঙ্গণ সমস্ত লোকে পুরিয়া গেল। পুরোহিত ও আত্মীয়স্বজনেরা চালার মধ্যস্থলে শালগ্রামাদি স্থাপন করিয়া দেবেন্দ্রনাথের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। চারিদিকে সমারোহ ও জনকোলাহল। ইত্যবসরে তিনি শ্যামাচরণকে লইয়া অন্যস্থানে গিয়া নির্দ্দিষ্ট মন্ত্র দ্বারা দানসামগ্রী উৎসর্গ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার জ্ঞাতিদিগের মধ্যে ভয়ানক গোলমাল উঠিল। তাঁহারা দেখিলেন, পুরোহিত নাই, শালগ্রাম শিলা নাই, অথচ দান

চলিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি দানসামগ্রী সকল উৎসর্গ করিয়া তেতলায় চলিয়া গেলেন। সেদিন আর কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইল না। পরদিন ভোজের নিমন্ত্রণে জ্ঞাতি, কুটুম্ব কেহ আসিলেন না। প্রায় সকলেই তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন।

স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার ঠাকুর বলিয়া পাঠাইলেন, "যদি দেবেন্দ্র এরূপ না করেন, তবে আমরা সকলে তাঁহার নিমন্ত্রণে যাইব " কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন, "যদি তাই হবে, তবে এতটা কাণ্ড করিলাম কেন?" এই ব্যাপারটি লইয়া কেহ কেহ হয় ত তাঁহাকে অপরাধী মনে করিবেন। কিন্তু বাস্তবিক কি দেবেন্দ্রনাথ এজন্য অপরাধী? পিতৃব্য, আত্মীয় ও জ্ঞাতি কুটুম্বের পরামর্শানুসারে কার্য্য করিতে পারিলেন না সত্য, কিন্তু ইহাতে তাঁহাকে অপরাধী মনে করা যায় না। যাঁহারা সত্য সত্যই কর্ত্তব্যপরায়ণ, যাঁহারা প্রকৃত ঈশ্বরের ভক্ত, তাঁহারা সর্ব্বদাই কর্ত্তব্যের দিকে, ঈশ্বরের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করেন। একদিকে তাঁহাদের ধর্ম্ম, অন্য দিকে সমস্ত জগৎ দণ্ডায়মান হইলেও তাঁহারা গ্রাহ্য করেন না, বা ভীত হয়েন না। যখন সকলে তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন, তখন তিনি বলিতেছেন— "জ্ঞাতি বন্ধুরা আমাকে ত্যাগ করিলেন, কিন্তু ঈশ্বর আমাকে আরো গ্রহণ করিলেন। ধর্ম্মের জয়ে আমি আত্মপ্রসাদ লাভ করিলাম। এ ছাড়া আমি আর কিছুই চাই না।"

সাধুতা।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের বিষয়বুদ্ধি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টি অতি প্রখর ছিল। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগের এরূপ সম্পদ্ চিরদিন থাকিবে না, পুত্রদিগের বিষয়বুদ্ধির অভাবে সমস্তই নষ্ট হইতে পারে। এজন্য তিনি কিছু কিছু সম্পত্তি একত্র করিয়া, এক ট্রষ্টডিড্ লিখিয়া তিন জন ট্রষ্টি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ঐ সম্পত্তি তাঁহাদেরই তত্ত্বাবধানে ছিল, পুত্রেরা কেবল তাহার উপস্বত্ব ভোগ করিতেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় প্রথম বার ইউরোপ হইতে ফিরিয়া আসিয়া ১৭৬৫ শকে এক উইল করেন; তদ্দ্বারা দেবেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথকে তাঁহার সম্পত্তি বণ্টন করিয়া দেন। তখন ইহাঁদের "কার ঠাকুর কোম্পানি" নামে এক কারবার ছিল। তাহার অর্দ্ধেক অংশ দ্বারকানাথ ঠাকুরের, আর বাকী অর্দ্ধাংশ কয়েক জন ইংরাজের ছিল। দ্বারকানাথ ঠাকুর নিজের অর্দ্ধাংশ দেবেন্দ্রনাথকে দিয়াছিলেন। কিন্তু সাধু দেবেন্দ্রনাথ সেই অর্দ্ধাংশ আপনার জন্য না রাখিয়া তিন সমান ভাগে ভাগ করিয়া, দুই ভাগ দুই ভ্রাতাকে দিয়াছিলেন। অতঃপর গিরীন্দ্রনাথের উপর সমস্ত বিষয়সম্পত্তি এবং ব্যবসায়ের ভার দিয়া তিনি কাশী ভ্রমণে বহির্গত

হইলেন। পিতার অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য প্রায় সমস্ত সম্পত্তিই নষ্ট হইতে লাগিল। এইরূপ শ্রুত হওয়া যায় যে, একবার "ডিনর" করিতে তাঁহার ৩০০৲ টাকা ব্যয় হইত। এতদ্ব্যতীত নানাপ্রকারের দান ও অন্যান্য ব্যয়ের জন্য তাঁহার অতুল সম্পদের অট্টালিকা টলমল করিতে লাগিল। এই অবস্থাতে তিনি দ্বিতীয়বার ইউ-রোপে গিয়া ১৭৬৮ শকে লণ্ডন নগরে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। কথিত আছে, তিনি মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়কে এত শ্রদ্ধা করিতেন ও ভালবাসিতেন যে, ইংলণ্ডে রাজার সমাধির পার্শ্বে চিরশয়ন করিবার জন্য ভগ্নশরীর লইয়া সেই সুদূর স্থানে গমন করিয়াছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন যে, তাঁহাদের "হাউস"—"কার ঠাকুর কোম্পানি"—টলমল করিতেছে। হুণ্ডী আসিতেছে, অথচ পরিশোধ করিবার টাকা জুটিতেছে না। অনেক কষ্টে টাকার সংস্থান করিতে হইতেছে। এক দিন ৩০০০০৲ হাজার টাকার এক হুণ্ডী আসিল, কিন্তু টাকা জুটিল না বলিয়া হুণ্ডী ফিরিয়া গেল। "কার ঠাকুর কোম্পানির" সম্ভ্রম গেল—আফিসের দরজা বন্ধ হইল। তখন দেবেন্দ্রনাথের বয়স ৩০ বৎসর। হিসাব করিয়া দেখা গেল যে, হাউসের মোট দেনা এক কোটি টাকা, পাওনা সত্তর লক্ষ টাকা, ত্রিশ লক্ষ টাকার অসংস্থান। সাধু দেবেন্দ্রনাথের হৃদয় কম্পিত

হইতে লাগিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, কি প্রকারে এই ঋণ শোধ করা যায়। অবশেষে তিনি এই স্থির করিলেন যে, পিতৃঋণ শোধ করিয়া যদি তাঁহাকে পথের ভিখারীও হইতে হয়, তাহাতেও তিনি পশ্চাৎপদ হইবেন না, যে কোন প্রকারেই হউক তাহা শোধ করিবেন। পিতার মৃত্যুর পরে শ্রাদ্ধের সময় এক অগ্নিপরীক্ষা আসিয়াছিল, এখন তাঁহার পিতৃঋণ শোধ করিবার সময় আর এক অগ্নিপরীক্ষা আসিয়া উপস্থিত হইল। আত্মীয় স্বজনেরা তাঁহাকে এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য বিষয়বুদ্ধির কুটিল ও অন্যায় পথ আশ্রয় করিতে পরামর্শ দিতে লাগিলেন। দ্বারকানাথ তাঁহার সন্তানদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আপনার সূক্ষ্ম ভবিষ্যৎ দৃষ্টি দ্বারা যে বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার সাহায্য গ্রহণ করিলে দেবেন্দ্রনাথ সহজেই এই বিপদ্ হইতে উদ্ধারলাভ করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না। তিনি সংসারে ছিলেন সত্য, কিন্তু সংসারী ছিলেন না। তিনি আবশ্যকবোধে বিষয় ভোগ করিতেন, কিন্তু বিষয়ের দাস ছিলেন না। পরিবার প্রতিপালন অবশ্যকর্ত্তব্য বোধে করিতেন, কিন্তু তাহার জন্য সাধারণ লোকের ন্যায় অন্যায় পথ অবলম্বন করিতেন না, বরং তাহা অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। তিনি এই সঙ্কল্প করিলেন যে, এক কপর্দ্দক

থাকিতে কখন শপথ করিয়া বলিবেন না, যে তাঁহার কিছুই নাই।

এই ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাদের প্রধান কর্ম্মচারী ডি. এম্. গর্ডন সাহেবকে দেনা পাওনার একটা হিসাব প্রস্তুত করিতে বলিলেন। তৎপরে পাওনাদারদিগকে আহ্বান করিয়া এক সভা করিলেন। তাহাতে গর্ডন সাহেব হিসাব দেখাইয়া বলিলেন, "হাউসের অধিকারীরা অন্যান্য সম্পত্তি দিয়াও ঋণ পরিশোধ করিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু একটী ট্রষ্টসম্পত্তি আছে, তাহার উপর কেহ হস্তার্পণ করিতে পারিবেন না।" ইহা শুনিয়া পাওনাদারেরা অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ পূর্ব্বসঙ্কল্প অনুসারে গর্ডন সাহেবকে বলিয়া দিলেন যে, "আমরা পিতৃঋণ শোধ করিবার জন্য আইন আদালতের মুখাপেক্ষা না করিয়া, সমস্ত সম্পত্তিই উহাঁদের হস্তে দিতে প্রস্তুত আছি।" পাওনাদারেরা স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, এ যুবক কি পাগল? অনায়াসে তিনি এই ট্রষ্টসম্পত্তি হইতে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তা করিলেন না—সাধারণতঃ মানুষ যাহা করে, তাহা করিতে প্রস্তুত হইলেন না। আজ যিনি অতুল ঐশ্বর্য্যশালী প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র, আজ যাঁহার প্রকাণ্ড বাসভবন দাসদাসীতে পরিপূর্ণ, আজ যাঁহার রাজ-প্রাসাদের ন্যায় পরম

রমণীয় অট্টালিকা নানাবিধ গৃহসজ্জাতে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, কাল তিনি পিতৃঋণ শোধ করিবার জন্য পথের ফকির হইতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না। এই ভাবিয়া তাঁহাদিগের অনেকে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, হাউসের উত্থান ও পতনে তাঁহাদের কোন হাত নাই। তাঁহারা সম্পূর্ণ নির্দোষ। এই অল্পবয়সে তাঁহাদের মস্তকে দারুণ বিপৎপাত হইল! কাল আর তাঁহাদিগের ভরণ পোষণের জন্য কিছুই থাকিবে না,—ইহা ভাবিয়া পাওনাদারেরা দয়ার্দ্র হইলেন! তাঁহারা ভাবিলেন, দেবেন্দ্রনাথ সংসারের মানুষ নহেন, কিন্তু স্বর্গের দেবতা। ত্রিংশৎ বৎসর বয়স্ক যুবকের এ প্রকার সাধুতা জগতে নিতান্ত বিরল। তাঁহারা প্রস্তাব করিলেন, যখন ইঁহারা স্বেচ্ছায় সকল ছাড়িয়া দিয়া ভিখারী সাজিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তখন এই সম্পত্তি হইতে বৎসরে ২৫০০০৲ টাকা করিয়া পাইবেন। এইরূপে গোলমাল মিটিয়া গেল। দেনাদার ও পাওনাদারদিগের মধ্যে একটা সদ্ভাব রহিয়া গেল। কেহ আর তখন পাওনার জন্য আদালতের সাহায্য গ্রহণ করিলেন না। দেবেন্দ্রনাথের সাধুতার জয় হইল। বিধাতা তাঁহাকে সকল বিপদ্ হইতে রক্ষা করিলেন।

এই রূপে ঋণমুক্তির সুব্যবস্থা হওয়াতে তাঁহার মনে কি আনন্দ হইয়াছিল, তাহা তাঁহার স্বরচিত জীবন-

চরিতের কয়েক ছত্র হইতে বুঝিতে পারা যায়। তিনি বলিতেছেন, "গাড়ীতে যাইতে যাইতে আমি গিরীন্দ্রনাথকে বলিলাম—'আমরা ত বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিয়া সকলি দিলাম'। তিনি বলিলেন—'হাঁ, এখন লোকে জানুক, আমাদের জন্য আমরা কিছুই রাখি নাই,—তাহারা বলুক যে, ইহারা সকল ধন দিলেন।' আমি বলিলাম, 'লোকে বলিলে কি হইবে? আদালত তো শুনিবে না। আদালতে যে কেহ একজন নালিশ করিলেই আমাদের শপথ করিয়া বলিতে হইবে যে, আমরা সকলি দিলাম, আমাদের আর কিছুই নাই। নতুবা আদালত আমাদিগকে ছাড়িবে না। কিন্তু যাবৎ অঙ্গে একখানি চীর থাকিবে, তাবৎ রাজদ্বারে দাঁড়াইয়া শপথ করিয়া বলিতে পারিব না, যে সব দিলাম। সকলি দিব, কিন্তু শপথ করিতে পারিব না। ঈশ্বর ও ধর্ম্ম আমাদিগকে রক্ষা করুন। যেন ইন্‌সল্‌বেণ্ট্‌ আইনে আমাকে মস্তক দিতে না হয়।' এই সকল কথাবার্ত্তায় আমরা বাড়ী পৌঁছিলাম। আমি যা চাই, তাই হইল। বিষয় সম্পত্তি সকলি হাত হইতে চলিয়া গেল। যেমন আমার মনে বিষয়ের অভিলাষ নাই, তেমনি বিষয়ও নাই, বেশ মিলে গেল। বিদ্যুৎ পড়ুক, বিদ্যুৎ পড়ুক, বলিতে বলিতে যদি বিদ্যুৎ পড়িয়া সব জ্বলিয়া যায়, তবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আমি বলিতাম যে, 'হে ঈশ্বর, আমি তোমা ছাড়া আর কিছু চাই

না।’ তিনি প্রসন্ন হইয়া এ প্রার্থনা গ্রহণ করিলেন। গ্রহণ করিয়া আমার নিকট প্রকাশ হইলেন এবং আর সব কাড়িয়া লইলেন। যাহা প্রার্থনাতে ছিল, তাহা পূর্ণ হইয়া এখন কার্য্যে পরিণত হইল। সে শ্মশানের সেই একদিন, আর অদ্যকার এই আর একদিন। আমি আর এক সোপানে উঠিলাম। চাকরের ভিড় কমাইয়া দিলাম, গাড়ী ঘোড়া সব নিলামে দিলাম। খাওয়া পরা খুব পরিমিত করিলাম, ঘরে থাকিয়া সন্ন্যাসী হইলাম। কল্য কি খাইব, কি পরিব, তাহার আর ভাবনা নাই। একেবারে নিষ্কাম হইলাম। নিষ্কাম পুরুষের যে সুখ ও শান্তি, তাহা উপনিষদে পড়িয়াছিলাম, এখন তাহা জীবনে ভোগ করিলাম। চন্দ্র যেমন রাহু হইতে মুক্ত হয়, আমার আত্মা তেমনি বিষয় হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোক অনুভব করিল। হে ঈশ্বর, অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে তোমাকে না পাইয়া প্রাণ আমার ওষ্ঠাগত হইয়াছিল—এখন তোমাকে পাইয়া আমি সব পাইয়াছি।”

“হাউসের” পতনের তিন চারি মাস পরে একদিন তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথ তাঁহাকে বলিলেন, “এত দিন গেল, কিন্তু ঋণের তো কিছুই শোধ হইল না। এইরূপ চলিলে ঋণ যে কখন পরিশোধ হইবে, তাহার কোন আশা নাই! এমন কি, আমাদের ঘর বাড়ী সকলই বিক্রয় করিলেও এই ঋণ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিব না।

অতএব আমি পাওনাদারদিগের নিকটে এই প্রস্তাব করিতে চাই যে, যদি তাঁহারা সমুদয় কার্য্যের ভার আমাদের হস্তে প্রদান করেন, তবে আমরা চেষ্টা করিয়া ঋণ পরিশোধ করিবার একটা উপায় করিতে পারি।" দেবেন্দ্রনাথ এই প্রস্তাব শুনিয়া আহ্লাদিত হইলেন এবং পাওনাদারদিগের সভাতে ইহা উত্থাপন করিলেন। তাঁহারা অতি আনন্দের সহিত এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন এবং দেবেন্দ্রনাথের উপর সমস্ত কাজ কর্ম্ম চালাইবার ভার দিলেন। দেবেন্দ্রনাথ বাড়ীতে আফিস উঠাইয়া আনিয়া তাহাতে একজন সাহেব ও একজন কেরাণী নিযুক্ত করিলেন এবং কঠিন পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই সময়ে তিনি কি প্রকার মিতাচারী হইয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে একটি ঘটনা শ্রুত হওয়া যায়। তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, এক বারে চারি আনার অধিক মূল্যের সামগ্রী আহার করিবেন না। ভোজনের সময় সমস্ত আহার্য্য দ্রব্য সম্মুখে আনীত হইলে, তিনি হিসাব করিতেন, সেই সমস্ত বস্তুর মূল্য কত। যদি দেখিতেন, চারি আনার অধিক, তাহা হইলে নিজ হস্তে মূল্যবান্ সামগ্রীগুলি সরাইয়া রাখিতেন এবং অবশিষ্ট ভোজন করিতেন। যাঁহার পিতার প্রত্যেক "ডিনরের" জন্য ৩০০৲ টাকা ব্যয় হইত, তিনি প্রত্যেক বারে চারি আনার অধিক মূল্যের আহার্য্য গ্রহণ করিতেন না!

তাঁহার সাধুতার অনেক দৃষ্টান্ত আছে, কিন্তু আর একটি মাত্র উল্লেখ করিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব। তাঁহার পিতা জীবিতাবস্থায় কোন দাতব্যসমিতিকে এক লক্ষ টাকা দান করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। পরে তিনি বিলাতে যান এবং সেখানে তাঁহার মৃত্যু হয়। সুতরাং তিনি সেই টাকা দিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর যখন দেবেন্দ্রনাথ পিতৃঋণজালে জড়িত হইয়া অতিশয় কষ্টে দিনযাপন করিতেছিলেন, তখন একদিন সেই সমিতির একজন কর্ম্মচারী আসিয়া বলিলেন, "মহাশয়, আপনার পিতা একলক্ষ টাকা দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা দিয়া যাইতে পারেন নাই, অতএব আপনি সেই টাকা আমাদের প্রদান করুন।" দেবেন্দ্রনাথ তখন কি অবস্থার মধ্যে বাস করিতেছিলেন, তাহা পাঠকেরা পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন। যাঁহার ভরণ পোষণের জন্য টাকার অভাব হইতেছে, তিনি পিতার অঙ্গীকৃত এত টাকা কি প্রকারে প্রদান করেন? এ অবস্থাতে যদি দেবেন্দ্রনাথ সেই প্রতিশ্রুত টাকা দিতে অসম্মত হইতেন, তাহা হইলে সাধারণ লোকের ন্যায় কাজ করা হইত, সেজন্য কেহ তাঁহাকে অপরাধী মনে করিত না। পিতা একলক্ষ টাকা দান করিবেন বলিয়াছিলেন, এখন তিনি মৃত। সুতরাং এই টাকার দাবিটা অগ্রাহ্য করিলেও বিশেষ অপরাধ হইত

না। বিশেষতঃ তিনি এখন যে প্রকার ঋণজালে জড়িত ও সংসারের গুরুভারে ভারাক্রান্ত, তাহাতে এই টাকা না দিলে সমালোচকগণ তাঁহার চরিত্রের উপর তীব্র দৃষ্টি করিতে পারিতেন না। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ সেদিক্ দেখিলেন না। তিনি ইহাকেও পিতার ঋণ বলিয়া গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন যে, "আপনারা আমাদের এখনকার সমস্ত অবস্থাই তো জানেন। আমরা এখন মহাজনদিগের ঋণ পরিশোধ করিতে অত্যন্ত ব্যস্ত আছি। সুবিধা হইলে পিতার এই অঙ্গীকৃত লক্ষ টাকা শোধ করিব এবং যত দিন তাহা না পারিব, তত দিন পর্য্যন্ত এই টাকার যথারীতি সুদও দিব।" এই কথা শুনিয়া সেই ব্যক্তি আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া দেবেন্দ্রনাথের সাধুতার প্রশংসা করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। বলা বাহুল্য যে, কিছুদিন পরে দেবেন্দ্রনাথ সুদ সহ এই লক্ষ টাকা সমিতির কর্ত্তৃপক্ষদের হস্তে প্রদান করিয়া পিতার অঙ্গীকার পালন করিয়াছিলেন।

জ্ঞানস্পৃহা।

দেবেন্দ্রনাথের জ্ঞানস্পৃহা অত্যন্ত বলবতী ছিল। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, তিনি সংস্কৃত মুগ্ধবোধ, রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য শাস্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন। তৎপরে যখন বেদান্ত ও উপনিষদের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা

হইল, তখন চারি বেদ অধ্যয়ন করিবার জন্য চারি জন ব্রাহ্মণকে কলিকাতা হইতে কাশীতে প্রেরণ করিলেন। অধ্যয়ন কালে তিনি তাঁহাদের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। তাঁহারা কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলে, দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাদিগের নিকট বেদপাঠ করিতেন এবং তাঁহাদেরই সাহায্যে বেদের বাঙ্গালা অনুবাদ "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে" রীতিমত প্রকাশ করিতেন। এইরূপে তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। তিনি ইংরাজী দর্শন ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের বহুল পরিমাণে চর্চ্চা করিয়াছিলেন। যখন তিনি পিতার ঋণ শোধ করিতে ব্যস্ত ছিলেন, তখনকার কার্য্য সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন,—"এই সময়ে আমি সকালে দুই প্রহর পর্য্যন্ত গভীর দর্শন শাস্ত্রের চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতাম। দুই প্রহরের পর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বেদ, বেদান্ত, মহাভারত প্রভৃতি শাস্ত্রের আলোচনায় ও বাঙ্গালা ভাষায় ঋগ্বেদের অনুবাদে নিযুক্ত থাকিতাম। সন্ধ্যার সময় ছাদের উপর প্রশস্ত কম্বল পাতিয়া বসিতাম। সেখানে আমার কাছে বসিয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্রাহ্মেরা এবং ধর্ম্মজিজ্ঞাসু সাধুরা নানা শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন। এই আলোচনাতে কখন কখন রাত্রি দুই প্রহরও অতিবাহিত হইয়া যাইত।" পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, তিনি হিউম, ব্রাউন, ফিক্‌টে, কাণ্ট, কুজিন প্রভৃতির রচিত পাশ্চাত্য দর্শন অতি মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কেবল যে যৌবনকালে তিনি

জ্ঞানালোচনাতে নিযুক্ত ছিলেন, তাহা নহে, যত দিন পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিতে সমর্থ ছিলেন, তত দিন পর্য্যন্ত জ্ঞানার্জ্জনে যত্নবান্ ছিলেন। আমাদের দেশে এ প্রকার দৃষ্টান্ত অতি বিরল।

এক দিন পরলোকগত শ্রদ্ধাস্পদ আনন্দমোহন বসু মহাশয় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। গিয়া দেখিলেন, তাঁহার টেবিলের উপর একখানি নূতন পুস্তক পড়িয়া রহিয়াছে। পুস্তক খানি বিজ্ঞানসম্বন্ধীয়। অল্পদিন পূর্ব্বে বিলাতে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে। দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। আর একবার এক ব্যক্তি গিয়া দেখিলেন, তাঁহার ঘরে "নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি" নামে বিখ্যাত মাসিক পত্র পড়িয়া রহিয়াছে। সেই ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয় কি এখানি রীতিমত পাঠ করিয়া থাকেন?" তিনি উত্তর করিলেন, "পাঠ করি বই কি! এখন আমার এখান হইতে চলিয়া যাওয়ার সময় হইতেছে, যাইবার সময় যত পারি সংগ্রহ করিয়া লইতেছি।" দেবেন্দ্রনাথ চিরদিনই এই ভাবে জ্ঞানচর্চ্চা করিয়াছেন।

স্বাধীনতাস্পৃহা ও স্বদেশীভাব।

পরলোকগত ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার সহিত বহু দিন হইতে সংসৃষ্ট ছিলেন। যখন দেবেন্দ্রনাথ "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" প্রকাশ করেন এবং যখন হইতে তিনি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন, তাহার কিছুদিন পরে তিনি রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের জ্ঞান, চরিত্র ও জীবন দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং তাঁহার দ্বারা আপনার কার্য্যের অনেক সহায়তা হইবে মনে করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হন। যদি তিনি এইরূপে তাঁহার সহিত মিলিত না হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার কার্য্য প্রকৃত সাহায্যকারীর অভাবে অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণেও অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত। যাহা হউক, তাঁহারা উভয়ে একমন ও একপ্রাণ হইয়া অনেক কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। বসু মহাশয় সভা সমিতি এবং তাহাতে বক্তৃতাদি করিতে ভাল বাসিতেন। তিনি রাজনৈতিক বিষয়েও অনেক ভাল ভাল বক্তৃতা করিয়াছেন। এক দিন দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে বলিলেন, "তোমাদের 'রিজলিউসন্' ইত্যাদি কিছুই বুঝি না। কাজের কাজ কিছু করিতে পার তো এস, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি এবং আমার যাহা সাধ্য তাহা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করিব।"

একবার তিনি বেরিলিতে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে

হিন্দু মুসলমানদিগের এক প্রকাণ্ড সভা হইয়াছিল। সভার নিয়মানুসারে একটি একটি প্রস্তাব হইতেছিল। সভার এক কোণে একজন জাঠ বসিয়াছিল। প্রত্যেক প্রস্তাবের পর সে হস্তস্থিত এক দীর্ঘ যষ্টি দ্বারা ভূমিতে আঘাত করিয়া 'লাঠ্' এই কথা উচ্চারণ করিতেছিল। সভাভঙ্গের পর দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন, "এই ব্যক্তি যাহা করিতেছিল, ইহাই ঠিক। ইহা ব্যতীত আর কিছুতেই কিছুই হইবে না।"

তিনি কখনই গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী ছিলেন না। একবার তাঁহাকে গবর্ণমেণ্ট এক উপাধি প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি কোন প্রকার উপাধির জন্য লালায়িত নহেন। ইহা শুনিয়া তখনকার ছোটলাট সার্ অ্যাস্লি ইডেন্ বলিয়াছিলেন, "He is too proud to have any title from us."

মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ।

একবার মহর্ষির কোন জামাতা ইংরাজীতে তাঁহাকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ খুলিয়া দেখেন যে, পত্রখানি ইংরাজী ভাষাতে লিখিত। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা আর একখানি খামে মুড়িয়া জামাতার নিকট প্রেরণ করিলেন। দেশীয় ভাষা ও দেশীয় ভাবে তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ ছিল। এ পর্য্যন্ত বঙ্গভাষার যে উন্নতি হইয়াছে, তাহার জন্য সমস্ত বঙ্গদেশ তাঁহার নিকট

অনেক পরিমাণে ঋণী। তাঁহার প্রকাশিত "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" এতাবৎকাল সুচারুরূপে পরিচালিত হইয়া বঙ্গভাষাকে জ্ঞানালোচনাতে, পারিপাট্যে এবং ভাবের গাম্ভীর্য্যে অনেক পরিপুষ্ট করিয়াছে। তাঁহার "ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের ব্যাখ্যান" ধর্ম্মজগতে এক অতুলনীয় বস্তু। ইহার ভাষা যেমন সরল তেমনি গাম্ভীর্য্যপূর্ণ, যেমন মধুর তেমনি উপদেশপ্রদ।

ভদ্র ব্যবহার।

দেবেন্দ্রনাথের ব্যবহার এত মধুর ছিল যে, যাঁহারা কখনও তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহারা জীবনে তাহা কখনও ভুলিতে পারিবেন না। একবার আমার এক জন বন্ধু তাঁহার বোলপুরস্থ "শান্তি-নিকেতনে" কিছু দিন বাস করিয়াছিলেন। বোলপুর হইতে ফিরিয়া আসিবার পর এক দিন প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। উক্ত বন্ধুটি শাস্ত্রাদির আলোচনা করিয়া থাকেন। শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার সহিত শাস্ত্র সম্বন্ধে আলাপ করিয়া বাটী আসেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অমুক ব্যক্তি যে "শান্তি-নিকেতনে" গিয়াছিলেন, তিনি সেখানে কেমন ছিলেন, তাঁহার সেবা শুশ্রূষা কেমন হইয়াছিল, তাঁহার কোন প্রকার অসুবিধা হয় নাই ত?" ইত্যাদি। শাস্ত্রী

মহাশয় বলিলেন, "এ সব বিষয়ে তাঁহার সহিত কোন কথা হয় নাই।" দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! এক জন ভদ্রলোক বোলপুরে গেলেন, আমাদের বাটীতে বাস করিলেন। সেখানে কেমন ছিলেন, এ কথা তুমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে না? এখনি তাঁহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া আইস।" শাস্ত্রী মহাশয় আসিয়া তাঁহাকে সেই বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া, দেবেন্দ্রনাথকে সংবাদ দেওয়ার পর তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন।

একবার তিনি সিমলা-পাহাড় হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। সে সময়ে রেলপথ এখনকার মত বড় সুবিধা জনক ছিল না। জলপথে অনেক সময়ে যাতায়াত করিতে হইত। তিনি এলাহাবাদে আসিয়া বহু অর্থ ব্যয়ে জাহাজের একটি প্রকোষ্ঠ ভাড়া করিয়া কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মধ্যপথে তাঁহাদিগকে অন্য একখানি জাহাজে উঠিতে হইল। তাহাতে অনেক সাহেব ও মেম যাত্রী ছিলেন। জাহাজখানি ছোট, সাহেবেরা কোন প্রকারে ডেকে আশ্রয় লইলেন কিন্তু মেমদিগের স্থানাভাব! অধ্যক্ষ আসিয়া প্রত্যেক সাহেবকে 'ক্যাবিন' ছাড়িয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেহই তাহাতে সম্মত হইল না। অবশেষে তিনি দেবেন্দ্র নাথকে অনুরোধ করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ আহ্লাদের সহিত আপনার প্রকোষ্ঠ ছাড়িয়া দিলেন।

এই ব্যবহার দর্শনে জাহাজের অধ্যক্ষ এত প্রীত হইয়াছিলেন যে, তিনি প্রত্যেক ইউরোপীয় ভদ্রলোকের নিকট গমন করিয়া বলিলেন, "একজন বাঙ্গালী আজ যে প্রকারে ইউরোপীয় মহিলাদের সম্মান করিলেন, তোমরা তাঁহাদের স্বদেশবাসী ও স্বধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও তাহা করিতে পারিলে না। এজন্য সকলের লজ্জিত হওয়া উচিত।"

হৃদয়ের বিশালতা।

পিতৃঋণ শোধ হইলে পর তিনি পুনরায় সম্পদের মুখ দেখিলেন এবং তদবধি পরোপকার ব্রত অবলম্বন করিয়া, জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে এই মহাব্রত পালন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার হৃদয় কি প্রকার উন্নত ও মহৎ ছিল, তাহার দুই একটী দৃষ্টান্ত এস্থলে প্রদত্ত হইতেছে। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, তিনি সভাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত চূড়ামণির নিকটে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। এক দিন চূড়ামণি মহাশয় একখানি কাগজ আনিয়া দেবেন্দ্রনাথকে বলিলেন, "ইহাতে সহি করিয়া দাও।" কাগজে লেখা ছিল, চূড়ামণির মৃত্যুর পর তৎপুত্র শ্যামাচরণকে তিনি চিরকাল প্রতিপালন করিবেন। দেবেন্দ্রনাথ অন্য কিছু না ভাবিয়া এবং কাহারও সহিত পরামর্শ না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া দিলেন। ইহার কিছু দিন পরে চূড়ামণির মৃত্যু হইল;

শ্যামাচরণ সেই কাগজ খানি আনিয়া তাঁহাকে দেখাইলেন। দেবেন্দ্রনাথ নিজের স্বাক্ষর স্বীকার করিলেন এবং উপযুক্ত বেতনে শ্যামাচরণকে কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।

যখন তিনি সিমলা-শৈলে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন একদিন একজন বাঙ্গালী যুবক তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আহারাদি সমাপন করিয়া যুবক দেবেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, "মহাশয়, আমি কলিকাতাতে বৈদ্যুতিকপ্রণালী অনুসারে চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। প্রথম যখন এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, তখন যন্ত্রাদি ক্রয় করিবার জন্য আমাকে কিছু দেনা করিতে হইয়াছিল। কিন্তু আমার কাজ কর্ম্ম ভাল চলিল না, সুতরাং ব্যবসায় বন্ধ করিতে হইয়াছে। মহাজনেরা তাঁহাদের পাওনা পরিশোধ করিবার জন্য আমাকে তাগিদ দিতেছেন। কিন্তু আমার অবস্থা এরূপ নহে যে, অত দেনা শোধ করিতে পারি। এ অবস্থাতে মহাশয় যদি অনুগ্রহ করেন, তবেই রক্ষা, নচেৎ আমি মহা বিপদে পড়িব।" দেবেন্দ্রনাথের কোমল অন্তঃকরণে করুণার উদয় হইল। তিনি তখন শিষ্য প্রিয়নাথ শাস্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, "যে কয়খানি কোম্পানির কাগজ আছে, লইয়া আইস।" কাগজগুলি আনীত হইলে বলিলেন, "এই কয়খানি কাগজ ঐ যুবককে দাও এবং বলিয়া দাও, যেন আমার নাম প্রকাশ না করে।" কাগজগুলি খুলিয়া দেখা গেল যে,

৬০০০৲ টাকার কাগজ! যুবক আনন্দে অধীর হইয়া দাতাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে করিতে চলিয়া গেল। এই ৬০০০৲ টাকার কাগজের ২০০০৲ টাকা সুদ হইয়াছিল। সুতরাং যুবক সর্ব্বসমেত ৮০০০৲ টাকা প্রাপ্ত হইল। এইরূপে তিনি গোপনে অনেক দান করিয়াছেন। আমার কোন বিশ্বস্ত বন্ধু মহর্ষির কোষাধ্যক্ষের মুখে শুনিয়াছেন যে, মহর্ষি প্রতি বৎসর নিয়মিতরূপে ৫২ হাজার টাকা দান করিতেন।

তাঁহার আর একটি কীর্ত্তির কথা উল্লেখ করিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব। বীরভূমের অন্তঃপাতী বোলপুর রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে এক ক্রোশ দূরে "ভুবন ডাঙ্গা" নামে এক বিস্তীর্ণ মাঠ আছে। পূর্ব্বে এই স্থানে অনেক পথিককে দস্যুহস্তে পতিত হইয়া প্রাণ হারাইতে হইত। ১৭৮৪ শকে দেবেন্দ্রনাথ সেই স্থানটি রায়পুরের জমিদারের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লয়েন; এবং বিপুল অর্থ ব্যয়ে ও বহু যত্নে সেখানে একটি সুরম্য ইষ্টকালয় ও বিবিধবৃক্ষসুশোভিত উদ্যান প্রস্তুত করেন। ইহার নাম "শান্তি-নিকেতন" আশ্রম। দুইটী উদ্দেশ্যে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথম, মহর্ষির নিজের নির্জ্জন সাধন ভজনের জন্য; দ্বিতীয়, নির্জ্জন সাধনের উপকারিতা বুঝিয়া, যাহাতে জনসাধারণ নগরের কোলাহল পরিত্যাগ করিয়া, প্রকৃতির এই সুরম্য স্থানে আসিয়া ঈশ্বরে

আত্মার সমাধান করিতে পারেন, তাহার জন্য। মহর্ষি মনে করিতেন যে, ভগবান্ কৃপা করিয়া তাঁহার হস্তে বিপুল সম্পত্তি ন্যস্ত করিয়াছেন, তিনি তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্যের ন্যায় তাহা রক্ষা করিবেন, এবং তাহা হইতে যে আয় হইবে, তাহা কেবল তাঁহারই ভোগের জন্য নহে, গরীব দুঃখীদেরও সেই ধনে অধিকার আছে। এই বিশ্বাসে তিনি কখনও ঋণ করিতেন না, এবং আয়ের কিয়দংশ আপনার পরিবারের ভরণপোষণের জন্য রাখিয়া, অবশিষ্ট সমস্তই লোকহিতার্থে ব্যয় করিতেন।

এই আশ্রমের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ মহর্ষি মাসিক ১৫০৲ টাকা আয়ের সম্পত্তি দিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা এখানে আসিয়া সাধন করিতে চাহেন, তাঁহাদের আতিথ্যের সুবন্দোবস্ত রহিয়াছে। এই "শান্তি-নিকেতন" প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি ধর্ম্মার্থীদিগের প্রভূত উপকার করিয়া গিয়াছেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

বার্দ্ধক্য ও অন্তিমকাল।

যে সকল পাঠক এ পর্য্যন্ত এই জীবনী পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই বুঝিয়াছেন যে, দেবেন্দ্রনাথ যদিও এই ক্ষুদ্র সংসারে বাস করিতেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয় এক বিশাল সৌন্দর্য্যময় রাজ্যে সর্ব্বদা বিচরণ করিত। সেই রাজ্যে বাস করিবার জন্য তিনি আশৈশব কতই যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন! সেই রাজ্যের পরমানন্দ, লাভ করিবার জন্য তিনি ইহ জগতের সমস্ত বস্তু অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ইহাই তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ ভাব! অনেক লোক তাঁহার অপেক্ষা অনেক বেশী দান করিয়াছেন, অথবা নানা প্রকার জনহিতকর কার্য্যে আপনাদিগকে নিযুক্ত করিয়া ধন্য হইয়াছেন। কিন্তু শৈশবকাল হইতে মানবজীবনের শ্রেষ্ঠতম লক্ষ্য বুঝিতে পারিয়া, চিরকাল তাহা সাধনে আপনাকে নিযুক্ত রাখিয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল। বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, প্রতিভা, অথবা লোকহিতকর কার্য্যে দেবেন্দ্রনাথের জীবনের বিশেষত্ব নহে, কিন্তু ঈশ্বরলাভের জন্য প্রবল পিপাসা এবং তাঁহারই আদেশে জীবনের কর্ত্তব্যপালন,—ইহাই তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব।

সচরাচর লোকে সংসারকে ধর্ম্মের প্রতিকূল মনে করে। প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, উচ্চ ধর্ম্ম-সাধন করিতে হইলে সংসারত্যাগী হইতে হয়। মহর্ষি স্বীয় জীবনে সুস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন যে, সংসারই ধর্ম্মের একমাত্র সাধনক্ষেত্র। ইহা সেই পুণ্যতীর্থ যেখানে মানব তাহার সমুদায় শক্তি বিকশিত করিয়া ভগবচ্চরণে কুসুমস্তবকাঞ্জলি অর্পণ করিতে পারে।

দেবেন্দ্রনাথ সিমলা-শৈল হইতে অমূল্য সত্যরত্নসমূহ হৃদয়ে লাভ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন এবং সাধারণের নিকট তাহা বক্তৃতা ও উপদেশাদি দ্বারা প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। কিছুদিন পরে স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। রাজনারায়ণ বসু, কেশবচন্দ্র সেন ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে সহায়রূপে প্রাপ্ত হইয়া দেবেন্দ্রনাথ অত্যন্ত উৎসাহের সহিত ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করিলেন। বঙ্গদেশে এক নবযুগের সূচনা হইল। এই সময়ে আদি ব্রাহ্ম সমাজের বেদী হইতে তিনি যে সমস্ত উপদেশ প্রদান করিতেন, তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া কলিকাতার যুবকমণ্ডলী সমাজে আসিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার প্রশান্ত, গম্ভীর ও সাধনদীপ্ত মুখ-বিনিস্থত উপদেশাবলী শ্রোতৃমণ্ডলীকে একেবারে মুগ্ধ করিয়া ফেলিত। কিছু দিন পরে কেশব-চন্দ্র প্রমুখ ব্রাহ্মগণ আপনাদিগের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ও

ভক্তি প্রদর্শন করিবার জন্য তাঁহাকে 'মহর্ষি' এই অনন্য-সাধারণ উপাধি প্রদান করেন।

একবার পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয় বোলপুর "শান্তি নিকেতনে" গমন করেন। সন্ধ্যার পর মহর্ষির সহিত আলাপ করিয়া তাঁহারা আহারান্তে শয়ন করিতে গেলেন মহর্ষি ছাদের উপরে উঠিলেন। সেদিন পূর্ণিমা। পূর্ণচন্দ্র সুনীল আকাশে উদিত হইয়া রজনীকে সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। মহর্ষি ছাদের উপর উপবেশন করিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মধ্যে নিমগ্ন হইলেন। রাত্রি ২।৩টার সময় শাস্ত্রী মহাশয় ও বসু মহাশয়ের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাঁহারা উপরে গিয়া দেখিলেন, মহর্ষি নিস্তব্ধভাবে বসিয়া আছেন। রজনী অতিবাহিত হইল, মহর্ষি একই ভাবে বসিয়া রহিলেন। পূর্ণিমার চন্দ্রের মধ্যে প্রেমচন্দ্রকে দর্শন করিয়া তিনি আত্মহারা হইয়াছিলেন!

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী অনেক দিন মহর্ষির সহিত একত্র বাস করিয়াছেন। তিনি বলেন, "কত দিন গভীর রাত্রিতে মহর্ষির সুমধুর কণ্ঠ-বিনিসৃত হাফেজের গজল্ আমার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া দিয়াছে! আমি অন্য প্রকোষ্ঠে শয়ন করিতাম। তাঁহার সেই মধুর স্বরে জাগ্রত হইয়া তাঁহার প্রকোষ্ঠে গমন করিতাম, এবং দেখিতাম, মহর্ষি ভাবে বিভোর হইয়া হাফেজের রচিত

সঙ্গীত গান করিতেছেন এবং তাঁহার দুই গণ্ড অশ্রুতে ভাসিয়া যাইতেছে। বিশেষতঃ যখন আমরা সিমলাতে বাস করিতাম, তখন গভীর রাত্রিতে নির্জ্জন হিমালয় বক্ষে প্রকৃতির সেই নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া যখন মহর্ষি হাফেজ গান করিতেন, তখন পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া যাইত, আমি অবাক্ হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিতাম।"

একবার তিনি দার্জ্জিলিং পরিত্যাগ করিয়া জলপথে মসুরি পর্ব্বতে যাইতেছিলেন। দামুকদিয়ার ঘাটে বজ্‌রাতে আরোহণ করিয়া কানপুরে গিয়া কিছুদিন বিশ্রাম করেন। জলপথে ভ্রমণের সময় তাঁহার এই নিয়ম ছিল যে, প্রতিদিন প্রাতে উপাসনান্তে দুগ্ধপান করিয়া নদীর তীর দিয়া হাঁটিয়া যাইতেন এবং যখন ক্লান্ত হইতেন, তখন আবার বজ্‌রাতে উঠিতেন। ভোজপুরে একদিন তিনি নামিয়া গেলেন, তাঁহার সঙ্গীরা অনেকক্ষণ তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া, কোন ঘাটে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। একজন চাকর তাঁহার সংবাদ আনিতে গেল, সেও ফিরিল না। অবশেষে প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার উদ্দেশে গমন করিলেন। তীরে উঠিয়া দেখিলেন, কোথাও জন মানবের সাড়া শব্দ নাই, কেবল পথের দুই পার্শ্বে গোধূম ও যবক্ষেত্র রহিয়াছে। তিনি প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ গিয়াছেন, এমন সময়ে

দেখিলেন যে, ১২।১৩ জন ভোজপুরী সুদীর্ঘ বাঁশের লাঠি লইয়া মহর্ষিকে ঘিরিয়া নদীর দিকে আসিতেছে। মহর্ষি উচ্চৈঃস্বরে হিন্দিতে হরিনাম গান করিতে করিতে আসিতেছেন। তখন বেলা দ্বিপ্রহর। মধ্যাহ্নকালের প্রখর সূর্য্যরশ্মিতে তাঁহার মুখ জবা ফুলের ন্যায় রক্তবর্ণ হইয়াছে। ললাট হইতে প্রবল বেগে ঘর্ম্ম নির্গত হইতেছে। তাঁহার সে দিকে দৃষ্টি নাই, হরিনাম গানে মত্ত হইয়া আসিতেছেন। শাস্ত্রী মহাশয় তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা বাবাজীকে কোথায় পাইলে?" তাহারা বলিল, "আমাদের বাগানে একটা শুক্‌না আমের গাছের গুঁড়িতে বসিয়া ভজন গাহিতেছিলেন। তাহা শুনিয়া গ্রামের লোকেরা বাবাজীকে দেখিতে আসিয়াছিল। বাবাজী যখন চক্ষু খুলিলেন, তখন নিকটে অনেক লোক জমা হইয়াছিল। তাহা দেখিয়া বাবাজী গঙ্গার দিকে চলিয়া আসিলেন।" মহর্ষি গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলে, তাহারা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, "বাবা, হামাকা আশীষ দিজিয়ে, হামাকা আশীষ দিজিয়ে" বলিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া, আপন আপন কার্য্যে চলিয়া গেল।

তিনি যখন হিমালয়ে বাস করিতেন তখন কখন কখন পর্ব্বতের পার্শ্বস্থ শিলাতলে বসিয়া ঈশ্বরের ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন এবং অনেক সময়ে সমস্ত প্রাতঃকাল ধ্যানে কাটাইতেন। এক দিন তিনি এইভাবে ধ্যানে মগ্ন

হইয়া ব্রহ্মসত্তার অনন্ত সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া গেলেন। চক্ষু উন্মিলন করিয়া দেখিলেন, বনাকীর্ণ পর্ব্বতের মধ্য দিয়া সুদীর্ঘ পথ চলিয়া গিয়াছে। তিনি আনন্দে সেই পথ ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। তখন দিবা অবসান-প্রায়। তাঁহার তখন বাহিরের কোন জ্ঞান ছিল না। তিনি ক্রমাগতঃ চলিতে লাগিলেন। অনেক-ক্ষণ পরে এক জন পথিককে দেখিতে পাইলেন, অমনি তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইল। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। চতুর্দ্দিকে বিশাল পাদপশ্রেণী। জনমানবের কোন চিহ্ন নাই। কেবল তাঁহার নিজের চরণদ্বয় শুষ্ক পত্রের উপর পতিত হইয়া মর্‌মর্‌ শব্দ করিতেছে। তিনি তখন সর্ব্ব-ব্যাপী ঈশ্বরের সত্তাসাগরে নিমগ্ন! তিনি অনুভব করিলেন যে, সেই মঙ্গলময়ের মঙ্গলদৃষ্টি অনিমেষে তাঁহার উপর নিপতিত রহিয়াছে! নির্ভীক্‌ চিত্তে তিনি বাটী প্রত্যা-গমন করিলেন। তখন রাত্রি ৮টা।

মহর্ষির সহিত যিনি কখনও সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন, তিনিই দেখিয়াছেন যে, মহর্ষি বক্ষঃস্থলে দুই হস্ত অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া ধ্যানমগ্ন রহিয়াছেন। ভারতের প্রাচীন ঋষিরা বলিতেন যে, ঈশ্বরকে তাঁহারা করতলন্যস্ত আমলকবৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন! বর্ত্তমান কালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও তাঁহাকে তদ্রূপ উপলব্ধি করিয়াছেন।

কোন সময়ে তিনি বিষয়সম্পত্তি রক্ষণের পরামর্শের জন্য

তাঁহার পিতৃব্য শ্রীযুক্ত °সন্নকুমার ঠাকুর মহাশয়ের নিকট গমন করিতেন। একদিন প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সম্মুখে নব বাঁড়ুয্যে মহর্ষিকে বলিলেন, "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" বড় ভাল কাগজ। আমি বাবুর লাইব্রেরিতে বসিয়া ইহা পড়ি; পড়িলে জ্ঞান হয়, চৈতন্য হয়।" মহর্ষি বলিলেন, "তুমি তত্ত্ববোধিনী পড়? পড়িও না, পড়িও না!" প্রসন্নকুমার ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, পড়িলে কি হয়?" তিনি বলিলেন, "আমার যে দশা, তাই হয়!" প্রসন্নকুমার ঠাকুর হাসিতে লাগিলেন। তার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা. ঈশ্বর যে আছেন, তাহা আমাকে বুঝাইয়া দাও দেখি?" দেবেন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন, "আচ্ছা, ঐ যে দেওয়ালটা আছে, তাহা আমাকে বুঝাইয়া দিন দেখি!" প্রসন্নকুমার ঠাকুর বলিলেন, "আরে, দেওয়াল, ঐ যে রহিয়াছে, আমি দেখিতেছি, ইহা আমি আর বুঝাইব কি!" তখন দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন, "ঈশ্বর যে সর্ব্বত্র রহিয়াছেন, আমি দেখিতেছি, ইহা আর বুঝাইব কি!"

মহর্ষি যখন চুঁচুড়াতে বাস করিতেন, তখন কলিকাতা হইতে সংবাদ গেল যে,তাঁহার তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর কঠিন পীড়াতে আক্রান্ত হইয়াছেন। প্রতিদিন সংবাদ যাইতে লাগিল। প্রত্যহ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাকে সংবাদ দিতেন। এক দিন রাত্রিতে সংবাদ গেল যে, হেমেন্দ্রবাবুর

মৃত্যু হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি প্রকারে পর দিন মহর্ষিকে এই সংবাদ দিবেন। পুত্রশোকে না জানি তিনি কতই কাতর হইবেন। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে রজনী প্রভাত হইল। মহর্ষি প্রাতে উপাসনান্তে দুগ্ধপান করিয়া বারান্দায় বেড়াইতেছিলেন। শাস্ত্রী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজকার সংবাদ কি?" শাস্ত্রী বলিলেন, "ভাল নয়, সেজো বাবুর মৃত্যু হইয়াছে।" "মৃত্যু হইয়াছে!" বলিয়া মহর্ষি একটু দাঁড়াইলেন এবং পুনরায় বেড়াইতে লাগিলেন। ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "তাঁহার সন্তানদিগের ও আমার মধ্যে তিনি একটা বাঁধ ছিলেন, এখন সে বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, জল আবার আমাতেই আসিয়া ঠেকিল, আমাকেই এখন তাঁহার সন্তানদিগের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।" এই বলিয়া কি প্রকারে পুত্রের মৃতদেহ সাজাইতে হইবে, কি ভাবে রাখিতে হইবে, কি ভাবে সৎকার করিতে হইবে এবং কি প্রকারে শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইবে,—এই সমস্ত বিষয়ে পরামর্শ দিতে লাগিলেন! সবল, সুস্থ, ধার্ম্মিক যুবক পুত্রের মৃত্যু হইল, আর তাঁহার কোন প্রকার চঞ্চলতা নাই বা ক্লেশ নাই। চক্ষু হইতে একবিন্দু জল পড়িল না, তিনি বিচলিত হইলেন না, স্থিরভাবে কর্ত্তব্য অবধারণে ব্যস্ত হইলেন।

"তন্দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং
গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং
মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি ॥"

যিনি দুঃদর্শ, গূঢ়রূপে সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন, যিনি আত্মস্থ, গূঢ়তম ও পুরাতন; ধীর ব্যক্তি অধ্যাত্ম-যোগ দ্বারা তাঁহাকে জানিয়া হর্ষশোকের অতীত হয়েন।

তাঁহার যোগ ও ভক্তি এত গভীর ছিল যে, যে ব্যক্তি একবার তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তিনি আর তাঁহাকে কখনও ভুলিতে পারেন নাই। ১৭৭০ শকে আশ্বিন মাসে মহর্ষি কয়েক জন বন্ধু সমভিব্যাহারে দামোদর নদীতে বেড়াইতে যান। দামোদরে বেড়াইতে বেড়াইতে এক দিন বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বর্দ্ধমান সহর দেখিতে ইচ্ছা হইল। রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া সহর দেখিতে চলিলেন। যখন বাসাতে ফিরিয়া আসিলেন, তখন রাত্রি অনেক হইয়াছিল। পর দিন সকালে দেখা গেল, একখানা সুন্দর ফিটন গাড়ী দামোদরের চড়া ভাঙ্গিয়া আসিতেছে। গাড়ী আসিয়া তাঁহা-দের বোটের সম্মুখে দাঁড়াইল। অমনি এক জন লোক গাড়ী হইতে নামিয়া মহর্ষির সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল। মহর্ষি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি চাও?" সে উত্তর করিল, "মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমানা-

ধিপতি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অত্যন্ত ইচ্ছুক হইয়া এই গাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছেন, আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করুন।" মহর্ষি বলিলেন, "আমি এখন নদী, বন, পর্ব্বতাদি দর্শনে বহির্গত হইয়াছি, রাজদর্শনে যাইবার সময় নাই।" তাহাতে সে ব্যক্তি অতি ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, "আমি আপনাকে লইয়া যাইতে না পারিলে মহারাজের নিকট অপরাধী হইব, আমার প্রতি কৃপা করুন, রাজাকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করুন। আপনার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধাভক্তি দেখিলে আপনি নিশ্চয়ই সন্তোষ লাভ করিবেন।" তাহার একান্ত অনুরোধে ও কাতরভাব দর্শনে তিনি যাইতে সম্মত হইলেন। ভোজনান্তে দুই প্রহরের সময় বর্দ্ধমান চলিলেন। তাঁহার জন্য পূর্ব্ব হইতেই একখানি সুন্দর সুসজ্জিত বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সেখানে পৌঁছিবামাত্র রাজার প্রধান প্রধান অমাত্যেরা তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিল। পরদিন তিন চারিখানি গরুর গাড়ী বোঝাই চাল, ডাল প্রভৃতি নানাপ্রকার খাদ্যসামগ্রী তাঁহার বাসাতে উপস্থিত হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সব কেন?" তাঁহারা বলিলেন, "রাজগুরুর জন্য যাহা নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাই মহারাজ আপনার জন্য পাঠাইয়াছেন।" সেই দিন দুই প্রহরের পর মহর্ষি রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। রাজা বহু সমাদরে, অত্যন্ত সম্মানের সহিত তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি মহর্ষিকে

ধরিয়া একখানি উচ্চ আসনে বসাইয়া দিলেন। আসন গ্রহণ করিলে পর, ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার সহিত অনেক কথাবার্ত্তা হইল। রাজা রাজবাড়ীর মধ্যে একটি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলেন এবং নিয়মিতরূপে কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য দুইজন আচার্য্য নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এইরূপে তাঁহার সহিত মহারাজের বন্ধুতা বাড়িতে লাগিল এবং অনেক সময় মহারাজা তাঁহাকে বাটীতে আনিয়া, তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিতে লাগিলেন। এক দিন ব্রহ্মোপাসনার পর রাজা এইরূপে প্রার্থনা করিলেন, "আমি কি অকৃতজ্ঞ! তিনি আমাকে এত সম্পদ্ দিয়াছেন, আমি তাহার জন্য তাঁহার কাছে যথোচিত কৃতজ্ঞ হই না, তাঁহাকে স্মরণ করি না। কিন্তু কত দীন, দরিদ্র তাঁহার নিকট হইতে অতি অল্প পাইয়াও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়, তাঁহাকে পূজা করে। আমি কি অকৃতজ্ঞ, কি অধম!"

এক দিন তিনি কলিকাতাতে গাড়ি চড়িয়া বেড়াইতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে কোন ব্যক্তি তাঁহার হাতে একখানি পত্র দিল। তিনি খুলিয়া দেখিলেন, সেই পত্র কৃষ্ণনগরের রাজা শ্রীশচন্দ্রের। তাহাতে লেখা ছিল, "কাল পাঁচটার সময় টাউন হলে সাক্ষাৎ করিলে আমি পরম সুখী হইব।" পর দিন মহর্ষির সহিত তাঁহার টাউনহলে সাক্ষাৎ হইল। সেখানে রাজা শ্রীশচন্দ্র তাঁহার সহিত কেবল ধর্ম্মালোচনাই করিলেন। যাইবার সময়

বলিয়া গেলেন, "আমি আর কিছু দিন এখানে আছি, অনুগ্রহ করিয়া যদি আর এক দিন আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন, তাহা হইলে বড় সুখী হই। আজ যাহা হইল, তাহাতে বড় তৃপ্ত হইতে পারিলাম না, আপনার সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে আরও আলাপ করিতে ইচ্ছা করি।" নবদ্বীপাধিপতি শ্রীশচন্দ্র হিন্দু সমাজের নেতা, আর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের নেতা। অথচ দুই জনে কেমন আত্মীয়তা হইয়া গেল। আর একদিন সন্ধ্যার সময়ে রাজা শ্রীশচন্দ্র তাঁহাকে বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া, নির্জ্জনে ধর্ম্মালাপ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন। অবশেষে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন, "এবার যখন আপনি কৃষ্ণনগর ব্রাহ্মসমাজে যাইবেন, তখন আমার বাড়ীতে থাকিতে হইবে।" তদনুসারে তিনি কৃষ্ণনগরে যাইয়া রাজবাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। প্রশস্ত ছাদের উপর নির্জ্জনে ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিয়া উভয়েই পরম প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন।

মহর্ষি যখন মসুরি-পর্ব্বতে বাস করিতেন, তখন দেবসমাজের সংস্থাপক শ্রীমৎ সত্যানন্দ অগ্নিহোত্রী তাঁহার সঙ্গলিপ্সু হইয়া, কিছুদিন তাঁহার সহিত বাস করিয়াছিলেন। তিনি মহর্ষির জীবনের সমুদায় ভাব লক্ষ্য করিয়া আপনার পত্রিকাতে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল;—"হে ধর্ম্মপিপাসু! যদি তুমি স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিতে চাও, তবে এস, চল, ঐ গুহাতে যে তাপস

সমাহিত রহিয়াছেন, তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত কর।
* * * * আহা! কি প্রেমোদ্ভাসিত, সুনির্ম্মল মুখশ্রী!
সুষমাতে সুশোভন পুষ্পও পরাজিত! যোগীর দেহ ভূতলস্থ,
কিন্তু উঁহার প্রাণ সেই প্রাণারামের সন্নিধানে অবস্থিত!"

মসুরি পর্ব্বতে বাস করিবার সময়ে অনেক প্রবীণ ও বিজ্ঞ ইংরাজ মহর্ষির সহিত ধর্ম্মালাপ করিতে আসিতেন। তন্মধ্যে বৃদ্ধ জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিত জেনারাল ওয়াকার তাঁহার সহিত ধর্ম্মালাপে এত তৃপ্ত হইয়াছিলেন যে, বাড়ী হইতে তিনি মহর্ষিকে যে পত্র লেখেন, তাহাতে "পূজনীয় পিতা" (Reverend father) এই পাঠ লিখিয়াছিলেন।

মহর্ষি সাধারণতঃ যে ভাবে দৈনিক জীবন যাপন করিতেন, তাহা চিন্তা করিলে তাঁহার জীবনের অনেক গূঢ় রহস্য জানিতে পারা যায়। তিনি প্রতিদিন ব্রহ্মমুহূর্ত্তে অর্থাৎ রাত্রি প্রায় ৪॥০ টার সময় গাত্রোত্থান করিয়া ঈশ্বরে আত্মার সমাধান করিতেন। তৎপরে যখন তরুণ তপন নির্ম্মলালোকে দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া পূর্ব্বাকাশে উদিত হইত, তখন একাকী সুনীল আকাশের নিম্নে উপবেশন করিয়া পূর্ব্বদিকে চাহিয়া থাকিতেন। প্রভাতে প্রকৃতি যখন নব সাজে সজ্জিত হইয়া জগতের সমক্ষে প্রকাশিত হয়, তখন তরুণ অরুণের আলোকরাশি তাহার উপর পতিত হইয়া যে কি মনোহর শোভা ধারণ করে, তাহা ভাবুক মাত্রেই অবগত আছেন। এই রমণীয় প্রভাতকালে মহর্ষি

পূর্ব্বাকাশের দিকে চাহিয়া থাকিতেন এবং সমস্ত জগতে তাঁহার প্রাণারাম পরমেশ্বরের প্রেমের প্রকাশ দেখিয়া আনন্দসাগরে মগ্ন হইতেন। তৎপরে ভ্রমণ করিতে বাহির হইতেন। এই রূপ শ্রুত হওয়া যায়, যে তিনি ৫।৬ মাইলের বেশী বেড়াইতেন। ফিরিয়া আসিয়া দুগ্ধ পান করিতেন এবং স্নান করিয়া উপাসনাতে বসিতেন। যখন তিনি পাহাড়ে বাস করিতেন, তখন প্রতিদিন দুই প্রহরের সময় বরফ মিশ্রিত জলে স্নান করিতেন। যাঁহারা পাহাড়ে বাস করেন, তাঁহারা শীতকালে সর্ব্বদাই গৃহে অগ্নি জ্বালিয়া রাখেন, নচেৎ অত্যন্ত কষ্ট হয়, কিন্তু মহর্ষি তাহা করিতেন না। এমন কি, পৌষ মাঘ মাসের শীতেও তিনি গৃহে অগ্নি জ্বালিতে দিতেন না। তিনি বলিতেন যে, সহিষ্ণুতা অভ্যাস করিবার জন্য তিনি এইরূপ করিতেন। রাত্রিতে শয়ন-গৃহের দরজা খুলিয়া রাখিতেন। শীতল বাতাস তাঁহার বড় ভাল লাগিত। মহর্ষি দিবানিদ্রা পছন্দ করিতেন না। সন্ধ্যার পূর্ব্বে পুনরায় উন্মুক্ত স্থানে বসিয়া সূর্য্যাস্ত দর্শন করিতেন। পাহাড়ে বাস করিবার সময়েও তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে শরীরে কম্বল জড়াইয়া, সেই প্রচণ্ড শীতের মধ্যে বা[illegible]রে বসিয়া সূর্য্যোদয় দর্শন করিতেন। রাত্রিতে আ[illegible]র করিয়া শয়ন করিতেন কিন্তু ভাল নিদ্রা হইত না। অনেক সময় ব্রহ্ম-সঙ্গীত ও ধ্যানে কাটাইতেন। এইরূপে তাঁহার দিন কাটিত। শেষে তাঁহার এমন অবস্থা হইয়াছিল যে, নিদ্রা প্রায় হইত

না। দিনযামিনী ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মানন্দরস-পানে বিভোর হইয়া থাকিতেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, মহর্ষি অতি অল্পকালই সহরে বাস করিতেন, অধিকাংশ সময়ই নদীবক্ষে, পর্ব্বতে ও প্রান্তরে কাটাইতেন। বহুকাল পর্ব্বতে বাস করিয়া তাঁহার এক প্রকার পীড়ার সঞ্চার হইাছিল। এই পীড়াতে তিনি ভবিষ্যতে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছিলেন। কিন্তু কি পীড়ার যন্ত্রণা, কি সাংসারিক দুঃখ শোক, কিছুতেই তাঁহার ব্রহ্মযোগ ভঙ্গ হইত না। বৃদ্ধ বয়সে অসুস্থ শরীরেও তিনি কি ভাবে গভীরতর যোগে যুক্ত হইয়া থাকিতেন, আমরা এ স্থলে তাহার দুই একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি।

যখন তিনি পর্ব্বতে বাস করিতেছিলেন, তখন একবার অত্যন্ত কঠিন উদরাময় রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। রোগ এত কঠিন হইয়াছিল যে, দুগ্ধ পর্য্যন্ত হজম হইত না। তিনি কোনপ্রকার ঔষধ সেবন করিতেন না। সর্ব্বদা এক খানি কম্বলে আপনার সমস্ত শরীর আবৃত করিয়া পড়িয়া থাকিতেন। এই সময়ে তিনি কোন বন্ধুকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা এই;—"কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে থাকিতে তুমি আমাকে অনুরোধ করিয়াছ, কিন্তু এই ক্ষণে আমার কোন স্থানেই শরীর ভাল থাকিবার সম্ভাবনা নাই। এই পুণ্যভুমি হিমালয়েই আমার শেষ দিন অবসান হইবে—এখানেই আমার প্রাণদাতার হস্তে প্রাণ সমর্পণ

করিয়া সিদ্ধি লাভ করিব।” যাহা হউক, ভগবানের কৃপায় তিনি সে যাত্রা বাঁচিয়া গেলেন। এই সময় এক দিনের একখানি পত্র বহুস্থান ঘুরিয়া তাঁহার ঠিকানাতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার ভিতরে একটি ব্রহ্মসঙ্গীত লেখা ছিল। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ঐ সঙ্গীতটি রচনা করিয়া তাঁহার নিকটে প্রেরণ করেন। সঙ্গীতটি অতি উৎকৃষ্ট ভাব ও রচনা সম্পন্ন—

খাম্বাজ—ঢিমে তেতালা।

“গাও হে তাঁহার নাম, রচিত যাঁর বিশ্বধাম,
দয়ার যাঁর নাহি বিরাম, ঝরে অবিরত ধারে।
জ্যোতি যাঁর গগনে গগনে, কীর্ত্তি ভাতি অতুল ভুবনে,
প্রীতি যাঁর পুষ্পিত বনে, কুসুমিত নব রাগে।
যাঁর নাম পরশ-রতন, পাপ-হৃদয়-তাপ-হরণ,
প্রসাদ যাঁর শান্তিরূপে ভকত-হৃদয়ে জাগে;
অন্তহীন নির্ব্বিকার, মহিমা যাঁর হয় অপার,
যাঁর শক্তি বর্ণিবারে বুদ্ধি বচন হারে।”

মহর্ষি কঠিন পীড়া হইতে মুক্তিলাভ করিলে, তাঁহার হৃদয় ঈশ্বরের প্রতি অধিকতর ভক্তি ও কৃতজ্ঞতাতে পূর্ণ হইয়াছিল। এই সময়ে উক্ত সঙ্গীতটি প্রাপ্ত হইয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, এবং হিমালয়ের বিচিত্র শোভাময় বিশাল বক্ষে ভ্রমণ করিতে করিতে, মনের আনন্দে বনভূমি নিনাদিত করিয়া সঙ্গীতটি গাহিতেন।

চুঁচুড়ায় অবস্থানকালে একবার তাঁহার জ্বর হয়। তিনি শয্যাশায়ী হইলেন। সেথানে ভাল চিকিৎসক ছিল না বলিয়া কলিকাতা হইতে প্রাচীন সুবিজ্ঞ ডাক্তার শ্রীযুক্ত নীলমাধব হালদারকে লইয়া যাওয়া হইল। ডাক্তার সাণ্ডার্স ও নীলমাধব হালদার তাঁহার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। অবস্থা পরীক্ষা করিয়া তাঁহারা বলিলেন, "সাত দিন পরে রোগীর মৃত্যু হইবে।" কিন্তু সাত দিন পরে তাঁহার দেহান্ত হইল না। বরং ক্রমেই তিনি আরোগ্য লাভ করিতে লাগিলেন। একদা তিনি কৌচে শুইয়া আছেন, এমন সময় বলিলেন, "দোয়াত, কলম, কাগজ দাও।" দেওয়া হইলে, তিনি লিখিলেন ;—

ওঁ

"আমার শরীর এথন Mechanical Force দ্বারা অপর কর্তৃক চালিত হইতেছে। Chemical Laboratory আমার শরীর হইয়াছে। * * * * শান্ত মঙ্গলস্বরূপ পরমাত্মার ক্রোড়ে আমার আত্মা নিহিত হইয়া রহিয়াছে। এই কয়টি ছত্র আমার আত্মা এই শরীর যন্ত্র যোগে বাহিরে প্রকাশ করিল। এখন এই সংসারে কোন যন্ত্রণা নাই, সকলই শান্ত!"

পাঁচ দিন পরে আবার লিখিলেন ;—"পরমাত্মার অনন্ত মূর্ত্তি ও জীবাত্মার অনন্ত গতি।" ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপে কি জ্বলন্ত বিশ্বাস!

ইহার কয়েক দিন পরে আবার জ্বর বাড়িল। সমস্ত দিন কথা নাই, আহারও নাই। অপরাহ্ণে একটু দুগ্ধ উদরস্থ করিবার জন্য চেষ্টা করাতে তিনি বলিলেন, "আমাকে আর ক্লেশ দিও না।" সন্ধ্যার পরে হুগলির সিভিল সার্জ্জন জুবার্ট আসিলেন এবং সমস্ত অবস্থা পরীক্ষা করিয়া বলিয়া গেলেন, রাত্রি অবসানের সঙ্গে সঙ্গে মহর্ষির জীবনেরও অবসান হইবে। সে রাত্রি, এবং তাহার পররাত্রিও কাটিয়া গেল। তারপর দেখা গেল, মহর্ষি বিছানেতে বালিশ ঠেশ দিয়া বসিয়া আছেন। প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার নিকটে গেলেন। মহর্ষি বলিলেন,—

"এ কি শুনিলাম! ঈশ্বরের আদেশ! ঈশ্বর বলিলেন, হে প্রিয়পুত্র, তুমি এ যাত্রা রক্ষা পাইলে। তুমি এখনো সম্পূর্ণরূপে তোমার গম্যস্থানের উপযুক্ত হও নাই, যখন তুমি সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত হইবে, তখন তোমাকে তোমার গম্যস্থানে লইয়া যাইব।"

এই সময় শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। মহর্ষি তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, "এক্ষণে দৃষ্টি হীন, নাড়ী ক্ষীণ, দিবারাত্রের গতি অনুভব করিতে পারি না—ন দিবা ন রাত্রিঃ শিব এব কেবলঃ। আমি এক্ষণে কেবল তাঁহাকে দেখিতেছি।" এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া গেল।

বসু মহাশয় বিদায় হইবার সময় পদধূলি গ্রহণ করিলেন। তাঁহার তখনকার মনের ভাব তিনি নিম্নলিখিত ভাষাতে প্রকাশ করিয়াছেন ;—"সেই সময়ের মনের অবস্থা বর্ণনীয় নহে। যখন মনে করিলাম যে, হয়তো তাঁহার সহিত আর ইহলোকে সাক্ষাৎ হইবে না—তখন আকুল হইয়া পড়িলাম। অগ্নিময় মস্তিষ্ক লইয়া নীচে আসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া লোকের সহিত কথা কহিতে পারিলাম না। হায়! হায়! এ জীবনের guide, philosopher and friend (পথপ্রদর্শক, জ্ঞানদাতা ও সুহৃৎ) চিরকালের জন্য পৃথিবী ছাড়িয়া যাইতেছেন। ইহা অপেক্ষা পৃথিবীতে আর কষ্টের বিষয় কি হইতে পারে ?"

ক্রমে ক্রমে মহর্ষি আরোগ্য লাভ করিলেন এবং তাঁহাকে কলিকাতায় আনিয়া চৌরঙ্গীতে রাখা হইল। বহুকাল রোগে ভুগিয়া দুর্ব্বলতা ও চর্ম্মশিথিলতা বশতঃ তাঁহার বৃহৎ অন্ত্রবৃদ্ধি রোগ জন্মিল। তিনি কলিকাতাতে আর থাকিতে পারিলেন না। প্রকৃতির সহিত তাঁহার এমনি একটা গভীর যোগ হইয়াছিল যে, তিনি সেই দুর্ব্বল অবস্থায়ও দার্জ্জিলিং যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। আত্মীয় স্বজনেরা তো ভাবিয়া আকুল। যিনি এত দুর্ব্বল যে, বিনা সাহায্যে এক পাও চলিতে পারেন না, তাঁহাকে এতদূর কি প্রকারে লইয়া যাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তিনি অটল। পর দিন দার্জ্জিলিং যাওয়াই স্থির

হইল, এবং প্রয়োজন মত সমস্ত ঠিক হইয়া গেল। তিনি সেখানে উপস্থিত হইলেন। সেই মুমূর্ষু অবস্থাতে তাঁহার কোন কোন কন্যা ও জামাতা নিকটে থাকিয়া সেবা করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া পত্র লিখিলেন। তিনি যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়! উত্তরটি এই ;—"প্রাণাধিক, আমি এই জরাজীর্ণ শরীর লইয়া ঈশ্বরের ইচ্ছাতে এই পৃথিবীতে অতি অল্পদিনই আছি, আমার এখানকার দিনের প্রায় অবসান হইয়াছে। এবং এখান হইতেই আমার নবতর কল্যাণতর দিনের অভ্যুদয় দেখিতেছি। এখন আমার সম্যক্‌রূপে যতির ধর্ম্ম পালন করা নিতান্ত প্রয়োজন। অতএব পরিজনের সঙ্গ হইতে বিবর্জ্জিত হইয়া একান্তে নির্জ্জনে তাঁহার সহিত যোগযুক্ত হইয়া থাকিতে হইবে। পরিজনের সঙ্গ চিত্তকে যোগে সমাহিত করিবার অন্তরায়। সহজেই সংসারের ধূলি আসিয়া চিত্তকে বিক্ষিপ্ত ও কলুষিত করে। এইক্ষণে এই ভগবদ্গীতার শ্লোকের অনুসরণ করিয়া আমাকে অবস্থান করিতে হইবে—

যোগী যুঞ্জীত সততং একান্তে রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতঃ জিতাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥

যোগী একান্তে, নির্জ্জনে, একাকী, সংযত জিতেন্দ্রিয়, নিরাশী ও অপরিগ্রহ হইয়া সতত যোগযুক্ত হইয়া থাকিবেন।

অতএব তোমরা এখানে এখন আসিতে ক্ষান্ত থাকিয়া আমার এই যোগের আনুকূল্য করিলে পরম সন্তোষ লাভ

করিব। তোমাদের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হউক, এই আমার শুভ আশীর্ব্বাদ। ইতি - ”

এই সময়ে একদিন তিনি বলিয়াছিলেন, “এখন নীড়ে মাতার পাখার নীচে শুইয়া রহিয়াছি। শীঘ্রই আমার পাখা উঠিবে, তখন মাতার সঙ্গে অনন্ত আকাশে উড়িয়া বেড়াইব। এ আনন্দ আর আমার মনে ধরে না।”

অতঃপর মহর্ষি জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরীর যতই দুর্ব্বল হইতে লাগিল, ইন্দ্রিয়গণ যতই নিস্তেজ হইতে লাগিল, তাঁহার আত্মা ততই অগ্রসর হইয়া অনন্ত স্বরূপ পরমাত্মার ক্রোড়ে অবস্থিতি করিতে লাগিল! ইহার প্রমাণ আমরা তাঁহার দুই খানি গ্রন্থ হইতে প্রাপ্ত হই। প্রথম “জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি,” দ্বিতীয় “পরলোক ও মুক্তি”। এই দুইখানি তাঁহার শেষ জীবনে প্রকাশিত গ্রন্থ এবং সাধকদিগের অতি উপাদেয় বস্তু। যাঁহারা মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন, তাঁহারাই এই গ্রন্থদ্বয়ে প্রকাশিত উচ্চজ্ঞান, পরলোক সম্বন্ধে বিজ্ঞানসিদ্ধ মত ও মহর্ষির অভিজ্ঞতালব্ধ ধর্ম্মের সত্যসমূহ অবগত হইয়া কৃতার্থ হইবেন।

এইরূপে তিনি শেষ জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মের অধীন হইয়া ১৮২৮ শকের ৬ই মাঘ বৃহস্পতিবারে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া অমরধামে গমন করিলেন।

পরিশিষ্ট।

বাল্যকালে সাধারণ মানব নানা প্রকার ক্রীড়া কৌতুকে ও আমোদ প্রমোদে রত থাকে। কিন্তু দেবেন্দ্র নাথ সেই বাল্যেই বৈরাগ্য অভ্যাস করিয়াছিলেন এবং সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যৌবন কালে যাহাতে তাঁহার সেই জ্ঞান ক্রমশঃ বিকশিত হয়, সেই জন্য তিনি অশেষবিধ ক্লেশ সহ্য করিয়া বনে জঙ্গলে, পাহাড়ে পর্ব্বতে, নদীবক্ষে ও নির্জ্জন প্রান্তরে জীবনের অনেক সময় ধর্ম্মসাধনে অতিবাহিত করিয়াছেন। তিনি উপদেশ দিয়াছেন ;—"যুবৈব ধর্ম্মশীলঃ স্যাৎ", যৌবন কালেই ধর্ম্মশীল হইবে। তিনি নিজ জীবন দ্বারা এই সত্য জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

আমাদের দেশে বহুকাল হইতে এই মত প্রচারিত হইতেছে যে, সংসারের ভিতরে থাকিয়া, বিষয় কার্য্যের মধ্যে বাস করিয়া, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা এবং ব্রহ্মযোগে যুক্ত হওয়া অতি কঠিন, এমন কি অসম্ভব। এই মত বিশেষ ভাবে শঙ্করাচার্য্য ও তাঁহার শিষ্যগণ কর্ত্তৃক ভারতে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। অতি প্রাচীন কাল অর্থাৎ উপনিষদ্ প্রভৃতির সময়ে ঋষিগণ, স্ত্রী, পুত্র পরিবেষ্টিত হইয়া সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মসাধন করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদের সাধনলব্ধ সত্যসমূহ এখনও সুসভ্য

ইউরোপ ও আমেরিকাতে প্রচারিত হইয়া ভারতের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। কিন্তু কালের স্রোতে এই ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া সংসার যে ব্রহ্ম সাধনের পক্ষে একান্ত প্রতিকূল, সেই মত জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, আমাদের প্রাচীন কালেয় আর্য্য মহর্ষিদিগের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া, বিষয়ের মধ্যে নির্লিপ্ত ভাবে বাস করিয়া, উচ্চ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন এবং নিত্য ব্রহ্ম-সহবাসে থাকিয়া জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি ধর্ম্মের জন্য সমাজ পরিত্যাগ করেন নাই, কিন্তু যখনই প্রয়োজন হইয়াছে, তখনই নগর পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে চলিয়া গিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি, মহর্ষি যখন সহরে বাস করিতেন, তখন সর্ব্বদাই তাঁহার জন্য সহর ছাড়িয়া যাইবার বন্দোবস্ত থাকিত, কি জানি কোন্ মুহূর্ত্তে তিনি বলিয়া বসেন, "পাহাড়ে চলিলাম"। বাটীর পরিজনবর্গ কেহ কিছুই জানেন না, এমন সময়ে হঠাৎ তাঁহার নিকট হইতে আদেশ হইল, "আমি নদীতে অথবা পর্ব্বতে বেড়াইতে যাইব।" অমনি সমস্ত ঠিক হইয়া গেল, আর মহর্ষি তৎক্ষণাৎ বাটী পরিত্যাগ করিলেন। পরমুহূর্ত্তে তাঁহাকে আর কলিকাতাতে দেখা গেল না। এমনি ভাবে তিনি সহরে বাস করিতেন। তাঁহার সাত পুত্র চারি কন্যা ছিল। জমিদারী, বহুবিস্তৃত না

হইলেও মন্দ ছিল না। সমস্ত জমিদারী ও বিষয় সম্পত্তি রক্ষার ভার তিনি উপযুক্ত কর্ম্মচারীদিগের হস্তে বিন্যস্ত করিয়াছিলেন এবং সময়ে সময়ে নিজেও দেখিতেন। কিন্তু সর্ব্বদাই তিনি তাঁহার বৃহৎ জমিদারীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের পর্য্যন্ত খবর লইতেন। তাঁহাকে এত গুলি সন্তানের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। সামাজিক সকল প্রকার কার্য্যে তাঁহার যোগ ছিল এবং আত্মীয়দিগের সহিত তাঁহাকে আত্মীয়তা রক্ষা করিতে হইত। সংসারে থাকিলে মানুষকে যাহা করিতে হয়, তাহা তিনি সমস্তই করিতেন, অথচ জীবনের যাহা লক্ষ্য তাহা কখনও বিস্মৃত হইতেন না। দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের লৌহশলাকা যেমন সর্ব্বদাই উত্তরাভিমুখে থাকে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনও তেমনি সর্ব্বদাই ব্রহ্মাভিমুখী হইয়া থাকিত। তিনি বলিতেন, "উত্তরকালে যাহাতে সুখী হইবে, তাহা এখন করিও, কিন্তু অনন্তকাল যাহাতে সুখী হইতে পার তাহা চিরজীবন ধরিয়া করিবে।" এই উপদেশ তিনি নিজ জীবনে সম্যক্‌রূপে পালন করিয়া গিয়াছেন।

শুভদাতা পরমেশ্বর কৃপা করিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে প্রকৃত জ্ঞান, প্রেম ও ব্রহ্মযোগ শিক্ষা দিবার জন্য ভারতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। যে ধর্ম্ম লাভ করিয়া ভারত আজ পরাধীনতার দুর্ব্বহ শৃঙ্খল ধারণ করিয়াও জগতের সমক্ষে আপনার গৌরবমণ্ডিত মস্তক সমুন্নত করিয়া রহিয়াছে,

যে গভীর ব্রহ্মযোগের পরমানন্দ সম্ভোগ করিবার জন্য সমস্ত জগৎ আগ্রহান্বিত হইয়াছে, যে ব্রহ্মপ্রেমস্রোতের সুমধুর কল কল ধ্বনি ভারত হইতে উত্থিত হইয়া ধীরে ধীরে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইতেছে, সেই জ্ঞান, সেই প্রেম ও সেই যোগ বাল্যকাল হইতে জীবনে সাধন করিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ অনন্তের শান্তিময় ক্রোড়ে বাস করিতেছেন!